গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ৬ সংখ্যা | ২ - ৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষে
তাঁর অমূল্য শিক্ষা

"রেভলিউশনারি কেউ হতে পারে না শুধু বুদ্ধি দিয়ে, বুদ্ধি এবং হৃদয়াবেগ, বুদ্ধি এবং মন, বুদ্ধি এবং নীতি-সংস্কৃতি এবং তা নিজের সমস্ত জীবনের সাথে মেলাতে হবে। এই মেলাতে না পারলে বিপ্লবী হওয়া যায় না। আবার বিপ্লবী হওয়ার পরও বিপ্লবীর অনেক স্তর আছে। তা হল, বিপ্লবী সংগ্রামের রাস্তায় অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ ক্ষমতাশালী স্তর। এটা বিপ্লবী হওয়ার স্তরই। আমি বিপ্লবের প্রক্রিয়ায় সচেতনভাবে ক্রিয়া করছি। তার মানে আই অ্যাম অ্যাক্টিভলি এনগেজড ইন দ্য স্ট্রাগল অফ দ্য মাসেস ফর জাস্টিস এগেনস্ট ইনজাস্টিস। একজন সচেতন কর্মী যে নাকি অত কিছু না বুঝলেও, বিদ্যাবুদ্ধি তেমন না থাকলেও বিপ্লবের জন্য যে কোনও সংগ্রাম করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে পার্টির দায়দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্নরাও তার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেবে। এই দুইজন দুই দিক থেকে যদি এটাকে মেনে নেন, তা হলেই একমাত্র কাজ সুশৃঙ্খলায়

পাঁচের পাতায় দেখুন

আইনসম্মত হলেই তা ন্যায়সঙ্গত কি?
প্রশ্নটা আবার উঠে এল

পেগাসাস কাণ্ডে কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত তদন্ত কমিটির সাথে সহযোগিতা করেনি। নাগরিকদের ফোনে সরকার আড়ি পেতেছে কি পাতেনি— এ নিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি পরিচালিত সরকার যে কোনও সদুত্তর দেয়নি, তা আদালতকে জানিয়ে দিয়েছে প্রাক্তন বিচারপতি রবীন্দ্রনের নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত কমিটি। তারা জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার অসহযোগিতাতেই কোনও সিদ্ধান্ত করা যায়নি। তাই আদালতও সিদ্ধান্তহীন থেকে গেছে। কিন্তু এত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে সরকার কর্তব্য পালন করেনি বলে আদালতও হাত গুটিয়ে থাকবে, এটা জনগণের কাম্য ছিল না।

সদ্য প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এনভি রমণা আশা দিয়েছিলেন, এই রিপোর্টের কতটা জনসমক্ষে আনা যায় তিনি খতিয়ে দেখবেন। সময় আর হল না, তিনি অবসর নিয়ে ফেললেন, বিষয়টা ঝুলেই রইল। ৩ বছর ধরে বিচারের অপেক্ষায় রয়েছে কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপের সাংবিধানিক বৈধতা, ৬ বছর ঝুলে ইউএপিএ সংক্রান্ত সাংবিধানিক মামলা, নতুন নাগরিকত্ব আইনের বৈধতা নিয়ে মামলা ঝুলে দীর্ঘ সময়। কর্ণাটকের হিজাব সংক্রান্ত মামলারও শুনানি কবে কেউ জানে না। প্রধান বিচারপতি হিসাবে এনভি রমণার প্রতিশ্রুতি ছিল, বিচারপতিদের বেঞ্চ গঠন করে এই মামলাগুলির অগ্রগতি ঘটাবেন। তিনি তাঁর কার্যকাল শেষ করে ফেললেন, অথচ সবই বকেয়া রইল।

প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ-এর বেঞ্চ রামমন্দিরের পক্ষে রায় দিতে গিয়ে ধর্মবিশ্বাসকেই যুক্তির ওপরে স্থান দেওয়ায় বিচার বিভাগের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র নিয়েই জনমানসে প্রশ্ন দেখা দেয়। সদ্য প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রমণা একাধিকবার বিচারবিভাগের স্বাধীনতার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখায় তা রক্ষার একটা আশার আলো অনেকে দেখছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে সমাজকর্মী, সাংবাদিকদের অন্যায় গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে বা

দুয়ের পাতায় দেখুন

বিলকিস বানো ঃ বিক্ষোভে গ্রেপ্তার গুজরাট রাজ্য সম্পাদক

বিলকিস বানোর ধর্ষণকারীদের পুনরায় গ্রেপ্তারের দাবিতে ১৯ আগস্ট আমেদাবাদে বিক্ষোভ। এসইউসিআই (সি) দলের গুজরাট রাজ্য সম্পাদক কমরেড মীনাক্ষী যোশী সহ আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ

এরাই পাড়ায় পাড়ায় বুথ কন্ট্রোল করে, তাই এত তোয়াজ

দীর্ঘ দিন ধরে রাজ্য সরকার নানা অছিলায় ক্লাবগুলিকে টাকা দিয়ে আসছে। বছর তিনেক শুরু হয়েছে পুজো কমিটিগুলিকে টাকা দেওয়া। কয়েক দিন আগে পুজো কমিটিগুলিকে ৬০ হাজার টাকা করে পুজো-অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী, যা গত বছরের থেকে ১০ হাজার টাকা করে বেশি। রাজ্যের ৪৩ হাজার পুজো কমিটিকে এ টাকা দিতে সরকারের খরচ হবে ২৫৮ কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রী বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থাগুলিকে পুজো কমিটিগুলির বিদ্যুতের বিলে ছাড় ৫০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬০ শতাংশ করার অনুরোধ করেছেন। সঙ্গে মনে করিয়ে দিয়েছেন, বিজ্ঞাপন বাবদ কোনও কর দিতে হয় না। এর সাথে আবার যোগ হয়েছে দুর্গাপুজোর স্বীকৃতি উৎসবে স্কুল-কলেজ-অফিস বন্ধ করে ১ সেপ্টেম্বরে মিছিল। এর টাকাও যোগাবে সরকার। সব মিলিয়ে পুজোবাবদ সরকারের খরচ বেড়ে গেল বিপুল অঙ্কের।

রাজ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান প্রভৃতি জনজীবনের

চারের পাতায় দেখুন

পুজো কমিটিকে দেদার সরকারি টাকা। প্রতিবাদ এসইউসিআই(সি)-র

দুর্গাপুজো কমিটিগুলিকে ৬০ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া প্রসঙ্গে এসইউসিআই(সি) রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২২ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন,

জনপ্রিয় এই উৎসব রাজ্যের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান ও সহায়তার মধ্য দিয়েই এতদিন হয়ে এসেছে। তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর কমিটিগুলিকে যে আর্থিক সাহায্য দেওয়া শুরু করে তা নির্বাচনসর্বস্ব রাজনীতিরই স্বার্থে, যার সাথে জনস্বার্থের কোনও সম্পর্ক নেই। রাজ্যে চরম আর্থিক সংকট চলছে। ফলে আশাকর্মী সমেত নানা ধরনের স্কিম ওয়ার্কাদের বেতন বৃদ্ধি, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের আর্থিক সাহায্য বা সরকারি কর্মচারীদের ডিএ দিতে সরকার ব্যর্থ হচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে পুজো কমিটিগুলিকে অনুদান দেওয়া বা তা বাড়ানোর আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি।

কলকাতার রাজপথ থেকে ৮২ জন ছাত্রছাত্রী গ্রেপ্তার

কোচবিহারে ফি বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনে মিথ্যা মামলায় জেলবন্দি ১৩ ছাত্রকর্মীর মুক্তির দাবিতে ১৩ আগস্ট কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে এআইডিএসও-র অবরোধ। পুলিশ এ দিন ৮২ জন আন্দোলনকারীকে গ্রেপ্তার করে।

আইনসম্মত হলেই তা ন্যায়সঙ্গত কি

একের পাতার পর

গণতান্ত্রিক অধিকার, মানবাধিকার রক্ষার প্রশ্নে বিচারবিভাগ যতটা বলেছে ততটা কাজে করে দেখাতে উদ্যোগ নেয়নি। এ দেশে এখন কত লক্ষ বন্দি বিচারের অপেক্ষায় দিন গুনতে গুনতে জেলে পচছেন তার সঠিক হিসাব কে রাখে? এদের অনেকেই যতদিন জেলে কাটিয়েছেন বিচার হলে সাজা হতে পারত তার থেকে অনেক কম। বিচারপতিরা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রায় দিয়ে বারবার বলেছেন, জামিন পাওয়া অভিযুক্তের অধিকার। এই অধিকার বাস্তবায়নের কাজ এগোল কোথায়?

সব দেশেই বুর্জোয়া শাসকদের মুখে মুখে ঘোরে পবিত্র আইনের শাসনের কথা। ভারতেও কেন্দ্রে কিংবা রাজ্যে যে দলই সরকারি গদিতে বসুক না কেন তাদের মুখের লজ্জই হল, 'আইন আইনের পথে চলবে', 'আমরা আইনের শাসনের ওপর আস্থাশীল'। শাসকরা যখন অন্যায় করে তার অধিকাংশের পিছনেই একটা আইনের স্ট্যাম্প তারা রেখে দেয়। আইনের দোহাই পেড়েই কেন্দ্রীয় সরকার যে কোনও সমালোচককে দেশদ্রোহী বলে জেলে পোরে। গুজরাট সরকার যখন বিলকিস বানোর ধর্ষক এবং শিশু সহ অন্য ১৪ জন মানুষের হত্যাকারীদের জেল থেকে ছেড়ে দেয়, যাতে বিজেপি নেতারা তাদের সংবর্ধনা দিতে পারে— তার পিছনেও কোনও না কোনও আইনের দোহাই দিতে পারে। ২০০২-এ গুজরাট গণহত্যার সঠিক এবং নিরপেক্ষ বিচার চাইবার অপরাধে তিস্তা শেতলবাদকে জেলে পুরতে কোনও একটা আইনের ধারা বার করতেও বিজেপি সরকারের অসুবিধা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে সরকার যখন ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলনকে 'সন্ত্রাস' আখ্যা দিয়ে ছাত্রদের জেলে ভরে, উত্তরপ্রদেশে সরকারি বুলডোজার প্রতিবাদীর বাড়ি গুঁড়িয়ে দেয়, কোভিড মহামারী মোকাবিলায় সরকারের ব্যর্থতাকে প্রকাশ করে দিলে যখন সাংবাদিকের উপর দমনের খাঁড়া নামে, এমন প্রতিটি অন্যায়ের পিছনেই সরকার জড়ো করতে পারে আইনের ধারা-উপধারার সমর্থন। আইনের দোহাই দিয়েই শ্রমিকের ন্যায্য পাওনার দাবিকে নস্যাৎ করে কারখানা যখন তখন লকআউট করতে পারে মালিক, পারে যথেচ্ছ ছাঁটাই করতে। অথচ তার বিরুদ্ধে শ্রমিকের ধর্মঘট হয়ে যায় বেআইনি। উন্নয়নের অজুহাতে সরকার দরিদ্র কৃষক কিংবা শহরের বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ করে, দরিদ্রের জীবন-জীবিকা ধ্বংস করে তাদের জমি ধনকুবেরদের উপহার দেয়, সেই অন্যায়ের পক্ষেও থাকে আইন।

তা হলে, এই 'গণতান্ত্রিক' ভারতে আইন কি সকলের জন্য সমান ন্যায়ের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত? সাধারণ মানুষ অভিজ্ঞতা থেকে বলবেন, না কখনওই নয়। দেখা গেল একেবারে শীর্ষ আদালতের বিচারপতিও তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, 'যা আইনসঙ্গত তা সর্বদা ন্যায়সঙ্গত নয়, আবার বহু ক্ষেত্রে কোনও কিছু ন্যায়সঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও বেআইনি হতে পারে।' গত ৬ আগস্ট গুজরাটের গান্ধীনগরে 'ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটির' সমাবর্তনে ছাত্রদের কাছে এই কথাই বলেছেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়। তিনি তাঁদের আইন এবং ন্যায় এই দুটির পার্থক্য মনে রাখতে বলেছেন। বিচারপতিকে ধন্যবাদ যে তিনি একটি সত্যকে নতুন করে স্মরণ করিয়েছেন। যদিও এ দেশের বুকে এই কথাটি বহুদিন আগে তুলেছিলেন, মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ। তিনি ১৯৬৭ সালেই বলছেন, 'যাহাই আইনসঙ্গত তাহাই সবসময় ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত এবং মানবিকতাসম্পন্ন নাও হতে পারে। আবার কোনও জিনিস প্রচলিত আইনের চোখে বেআইনি হলেই তা অন্যায় অযৌক্তিক এবং অমানবিক হয় না' (নির্বাচিত রচনাবলি তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৫)। কিন্তু সে দিন বুর্জোয়া রাজনীতিবিদরা তো বটেই এমনকি তথাকথিত বামপন্থীরাও অনেকে ভুরু কুঁচকেছিলেন।

আজ সংসদ-বিধানসভা থেকে শুরু করে প্রশাসন, পুলিশ এদের কেউ জনস্বার্থে কাজ করবে এমন আশা জনগণ ছেড়ে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাটাকে সাধারণ মানুষের কাছে অন্তত কিছুটা সহনশীল করে তুলতে সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে বুর্জোয়া রাজনীতিবিদ, চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবীরা দেখানোর চেষ্টা করেন, কোথাও সুরাহা না মিললে তোমার জন্য আদালত আছে। এই প্রচারে প্রভাবিত হয়ে অনেকে মনেও করেন, বিচারব্যবস্থাই আজ একমাত্র ভরসা। কিন্তু বিচারালয় দাঁড়াবে যে আইনের ওপর, তার ন্যায়ের ধারণাটা কোন ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে? ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টে 'জনগণের বিচারপতি' বলে পরিচিত, ভি আর কৃষ্ণ আইয়ার বলেছিলেন, 'আমাদের আইন সকলের দিকেই ঘেউ ঘেউ করে, কিন্তু কামড়ায় শুধু দরিদ্র, শক্তিহীন, অশিক্ষিত, অজ্ঞ মানুষকে।' আইন কি তা হলে সকলের জন্য সমান? কোনও শ্রেণিবিভক্ত সমাজে আইন কি সকলের জন্য সমান হতে পারে? বিচারপতি আইয়ার দেখিয়েছেন, পুঁজিপতি শ্রেণি যেমন সমাজের উচ্চ শ্রেণি থেকেই প্রশাসক-আমলাদের বেছে নেয়, আইনসভার জন-প্রতিনিধিদের তারা কিনে রাখে, তেমনই 'বিচারপতিদের বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রেও কাজ করে শ্রেণিগত পক্ষপাতিত্ব। এমনকি বিচারব্যবস্থা এবং তার মধ্য দিয়ে যে বিচারপ্রক্রিয়া কার্যকরী হয়, তাদের সকলেরই শ্রেণিচরিত্র আছে।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'এই শ্রেণিচরিত্রের জন্যই বিচারব্যবস্থা আইনের যে ব্যাখ্যা উপস্থিত করে তা সার্বিক অর্থে ধনবান শ্রেণিকেই সাহায্য করে, সম্পত্তিহীনদের নয়। সামাজিক স্তরবিন্যাস, প্রশাসকদের শাসনদণ্ড, আইনসভা এবং বিচারব্যবস্থা প্রত্যেকেরই রাজনৈতিক চরিত্র আছে' (পভার্টি অ্যান্ড পলিটিক্স অফ জুডিসিয়ারি ঃ কৃষ্ণ আইয়ার, দ্য হিন্দু ২৯.১২.২০১৩, এবং দ্য হিন্দু ৪.১২.২০২১)।

যাঁরা মার্ক্সবাদ অচল বলে লাফিয়ে বেড়ান, সেই সব মহা পণ্ডিত বুদ্ধিজীবীরা বিচারব্যবস্থা সম্বন্ধে বিচারপতি আইয়ারের এই পর্যবেক্ষণ অস্বীকার করার সাহস দেখাবেন কি? মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ বহু আগেই দেখিয়েছে একটা শ্রেণিবিভক্ত সমাজে রাষ্ট্র মানেই একটা শ্রেণির রাষ্ট্র। বিচারব্যবস্থা হল সেই রাষ্ট্রের অন্যতম একটা স্তম্ভ। তাই বিচারব্যবস্থা তথাকথিত নিরপেক্ষতার চাদর গায়ে দিয়ে রাষ্ট্রের শাসক-শোষক শ্রেণিরই সেবা করে মূলত। আবার কখনও কখনও পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটাকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই বিচারব্যবস্থাকে শ্রমিকের পক্ষে, দরিদ্রের পক্ষে, শাসকের বিরুদ্ধে রায় দিতে হয়। না হলে পুরো ব্যবস্থাটাই জনগণের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে। দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলন, প্রগতিশীল বামপন্থী আন্দোলনের শক্তি কতটা তার ওপরেও বিচারব্যবস্থার আপাত নিরপেক্ষতা অনেকটা নির্ভর করে। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা বলছে, স্কুলে নানা স্তরে নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতি নিয়ে অনেক মামলা চললেও সেই সব মামলায় শাসকের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ রায় আসার পথ করে দিয়েছে চাকরিপ্রার্থীদের দীর্ঘ আন্দোলন এবং জনমানসে তার প্রভাব। এ অভিজ্ঞতা নতুন নয়, মানবাধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার সংক্রান্ত আইনগুলি সংসদ-বিধানসভা কিংবা বিচারালয়ে মান্যতা পেয়েছে একমাত্র তখনই যখন দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জোয়ার উঠেছে। তা স্তিমিত হলে বিচারালয়ও মুখ ফেরায়।

পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা আজ মানবসমাজের অগ্রগতির পথে প্রধান বাধা। সর্বগ্রাসী সংকটে এই ব্যবস্থা আজ একেবারে জীর্ণ। পুঁজিবাদ তার বাঁচার মরিয়া প্রচেষ্টায় মানুষকে চরম শোষণে রিক্ত করে দিচ্ছে। এই দুর্বিষহ অবস্থার বিরুদ্ধে যাতে কেউ মাথা তুলে না দাঁড়ায় তা নিশ্চিত করতে সমাজ থেকে সমস্ত ভালমন্দ বোধ, মূল্যবোধ একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রক্ষকরা। সংকটের মধ্যেও যে ভাবে হোক মুনাফা অর্জনেরর তাগিদে জল-জঙ্গল-জমি-প্রাকৃতিক সমস্ত সম্পদকে যথেচ্ছ লুঠ করছে পুঁজিপতিরা। এর বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদী স্বর উঠলেই তাকে গলা টিপে মারতে গণতন্ত্র, আইন, বিচার সবকিছুকে একেবারে কবরে পাঠাতে তাদের দ্বিধা নেই। তার উপর গণতান্ত্রিক আন্দোলন, বামপন্থী আন্দোলনের দুর্বলতার সুযোগে আজকের শাসকরা মানবাধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার, শ্রমিকের অধিকার, চাষির অধিকার, বনাঞ্চলে স্বাভাবিক অধিবাসীদের অধিকার একের পর এক কেড়ে নিতে বদ্ধপরিকর। স্বাভাবিকভাবেই তার প্রভাব পড়ছে বিচারবিভাগেও। কোনও বিশেষ বিচারপতি তাঁর বিবেক এবং জুরিস প্রুডেন্সের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে ব্যক্তিগতভাবে গণতান্ত্রিক অধিকার, ব্যক্তি পরিসরের মর্যাদা, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে রক্ষা করার কথা বলতে পারেন। কেউ কেউ বলছেনও। কিন্তু যখনই সামগ্রিকভাবে তা প্রয়োগের প্রশ্ন আসছে, সরাসরি জনগণের হয়ে দাঁড়ানোর প্রশ্ন আসছে, তখনই যেন আর বিচারবিভাগের পা চলতে চায় না।

বিচারবিভাগের কাছ থেকে আপাত অর্থেও ন্যায়বিচার আদায় করতে হলে আজ কী দরকার— সে পথ দেখিয়েছেন মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ। তিনি বলেছেন, 'মন্দ আইনগুলোকে পাল্টাতে হলে গণআন্দোলনের মারফত প্রবল জনমত সৃষ্টি করতে হবে। আর এ কথা মানতেই হবে যে, এই জনমতের প্রভাব সবার ওপরেই কাজ করে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের ওপরেও এর প্রভাব পড়ে, আইন প্রণয়নকারীদের ওপরেও এর প্রভাব পড়ে। এমনকি যাঁরা বিচার করেন তাঁদের ওপরও এই জনমত প্রভাব বিস্তার করে। জনমতের প্রভাব যদি না সৃষ্টি করা যায় তাহলে খুব নীতিসম্মত আইনের ব্যাখ্যাগুলোও ন্যায়নীতিসম্পন্ন হয় না, জনস্বার্থের অনুকূল হয় না, জনস্বার্থের পরিপূরক হয় না' (নির্বাচিত রচনাবলি তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪১)।

এই নিষ্ঠুর পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কাছ থেকে অন্তত একটু ন্যায়বিচার পেতেও আজ তাই সংগঠিত গণআন্দোলন, বামমনস্ক গণতান্ত্রিক বোধসম্পন্ন মানুষের ঐক্যবদ্ধ লড়াই ছাড়া রাস্তা নেই।

জীবনাবসান

দলের ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল সাংগঠনিক জেলা কমিটির অন্তর্গত ভাটপাড়া-জগদ্দল লোকাল কমিটির প্রবীণ কর্মী শ্রমিক নেতা কমরেড গোপাল তেওয়ারি ৬ আগস্ট শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর।

কমরেড গোপাল তেওয়ারি জগদ্দল অ্যাংলো-ইন্ডিয়া জুটমিলের একজন সাধারণ শ্রমিক ছিলেন। তিনি ১৯৫৫ সালে দলের সঙ্গে যুক্ত হন। সেই সময়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে জগদ্দল শিল্পাঞ্চলের চটকলগুলোতে শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে তুলছিলেন প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা কমরেড সনৎ দত্ত। তাঁর পরিচালনায় শীঘ্রই কমরেড গোপাল তেওয়ারি জগদ্দল শিল্পাঞ্চলের একজন দায়িত্বশীল বামপন্থী শ্রমিক নেতায় পরিণত হন এবং জগদ্দল অ্যাংলো-ইন্ডিয়া জুটমিলের প্রভিডেন্টফান্ড ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালে কমরেড শিবদাস ঘোষ যখন চটশিল্পভিত্তিক শ্রমিক সংগঠন বেঙ্গল জুটমিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন গঠন করেন তখন রেজিস্ট্রেশনের জন্য ৭ জন আবেদনকারী সদস্যের অন্যতম ছিলেন কমরেড গোপাল তেওয়ারি। জগদ্দল শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক ও সাধারণ মানুষকে যুক্ত করে দলের জগদ্দল ইউনিট গড়ে তোলাতেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর আজীবন শ্রমিক বস্তির একটিমাত্র ছোট ঘরে সপরিবারে অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যে তিনি থাকতেন। কিন্তু এ নিয়ে তাঁর মধ্যে কোনও অভাববোধ ছিল না। দারিদ্র ও বয়সজনিত অসুস্থতাকে উপেক্ষা করেই যতদিন সক্ষম ছিলেন দলের কাজে যথাসাধ্য অংশগ্রহণ করতেন। তাঁর সততা ও শ্রমিকদের সঙ্গে সহজে মিশে যেতে পারার গুণের কারণে তিনি এলাকায় সুপরিচিত ছিলেন।

কমরেড তেওয়ারির আর একটি অসাধারণ গুণ ছিল উদাত্ত, বলিষ্ঠ কণ্ঠে গণসঙ্গীত পরিবেশনের ক্ষমতা। শ্রমিক কর্মচারী ও সাধারণ মানুষকে উদ্দীপিত করার মতো গান হিন্দি এবং বাংলা উভয় ভাষাতেই তিনি নিজেই লিখতেন এবং সুর দিতেন। উনিশশো পঞ্চাশ-ষাটের দশকে কলকাতায় দলের রাজ্য স্তরের সভায় এমনকি তৎকালীন বামপন্থী দলগুলোর যুক্তফ্রন্টের সভাতেও কমরেড তেওয়ারি তাঁর অননুকরণীয় গণসঙ্গীত গেয়ে কমরেডদের ও জনসাধারণের মধ্যে সংগ্রামী প্রেরণার সঞ্চার করেছেন। বৃদ্ধ বয়সেও দীর্ঘকাল দলের সভায় তাঁর সঙ্গীত পরিবেশন অব্যাহত ছিল। তাঁর প্রয়াণে দল প্রথম যুগের কঠোর সংগ্রামী ও বহু গুণের অধিকারী এক একনিষ্ঠ সদস্যকে হারাল।

কমরেড গোপাল তেওয়ারি লাল সেলাম

জন্মশতবর্ষে শিবদাস ঘোষ

শিবদাস ঘোষের চিন্তায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী ধারার সংগ্রামী, এস ইউ সি আই (সি)-র প্রতিষ্ঠাতা শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষ চলছে। শিবদাস ঘোষ শুধু এ দেশেরই নন, বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি আন্দোলনের নেতা। জীবনের সমস্ত দিক ঘিরে যে সমস্যা মানুষকে, সমাজকে প্রতি মুহূর্তে পিষ্ট করছে, তিনি তার সমাধানের বিজ্ঞানসম্মত পথ দেখিয়েছেন। প্রতিটি সমস্যায় উত্তরণের যথার্থ পথ দেখিয়ে তিনি শ্রমজীবী জনসাধারণের আদর্শগত নেতায় পরিণত হয়েছেন। জন্মশতবর্ষে তাঁর মূল্যবান শিক্ষাগুলি বারবার উচ্চারিত করা ও আত্মস্থ করা জরুরি। এই সংখ্যায় থাকছে স্বাধীনতা আন্দোলন ও তার নানা দুর্বলতা সম্পর্কে শিবদাস ঘোষের বিশ্লেষণ।

ব্রিটিশের অধীনতা থেকে ভারতের মুক্তি অর্জনকে শিবদাস ঘোষ বলেছেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন। কারণ শাসকের বদল ছাড়া এই স্বাধীনতা শোষিত জনগণকে আর কিছু দিতে পারেনি। স্বাধীনতার যে মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল তা এই পালা বদলের মধ্য দিয়ে হয়নি। কেন হয়নি, কোথায় কোথায় এর দুর্বলতা ছিল, তা নানা দিক থেকে ব্যাখ্যা করে শ্রমজীবী মানুষের সামনে কর্তব্য কী, তা নির্ধারণ করে গেছেন শিবদাস ঘোষ। ব্রিটিশের চলে যাওয়াকে একটা মৌলিক পরিবর্তন, বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন বলেছেন তিনি। ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লব। সঠিকভাবে বলতে গেলে বুর্জোয়া বিপ্লব— যার নেতৃত্বে ছিলেন বুর্জোয়াদের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি গান্ধীজি। আর এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণি।

এই স্বাধীনতা দেখতে দেখতে ৭৫টি বছর পার করে ফেলল। সম্প্রতি মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল স্বাধীনতার হীরক জয়ন্তী। বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা, ক্লাব, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন রাজ্য সরকার এই অনুষ্ঠান নানা ভাবে পালন করেছে। কেন্দ্রের সরকারে আসীন বিজেপি, যার আদর্শগত গুরু আরএসএস তাত্ত্বিকরা ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতার সংগ্রামকে জাতীয়তাবাদ বলে মানতে চাননি, যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াইকে মনে করতেন আসল জাতীয়তাবাদ, তাঁরা আজ 'হর ঘর তিরঙ্গা' আওয়াজ তুলে মহা আড়ম্বরে স্বাধীনতার 'অমৃতকাল' পালন করলেও সে কলঙ্ক ঢাকা পড়ছে না। বরং কেন্দ্রের সরকারে আসীন হয়ে বিজেপি যে ভাবে আজ মত প্রকাশের অধিকার, সমালোচনার অধিকারকে প্রতি মুহূর্তে হরণ করছে, এমনকী একটা ব্যাঙ্গাত্মক ছবি বা কার্টুন আঁকার মতো কার্যক্রমকে দেশদ্রোহিতা আখ্যা দিয়ে শিল্পীকে কারারুদ্ধ করছে, তাতে কার স্বাধীনতা, কার গণতন্ত্র প্রশ্নগুলিই মূর্ত হয়ে উঠছে।

কার স্বাধীনতা, শাসকের না শোষকের

সঠিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে স্বাধীনতা কার? ব্যক্তির না দেশের? ব্যক্তির স্বাধীনতা ব্যতিরেকে দেশের স্বাধীনতার মানেই বা কী? দেশ মানে তো শুধুমাত্র একটা কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া ভৌগোলিক এলাকা নয়, তার সাথে দেশের মানুষও। সেই মানুষের কতটুকু স্বাধীনতা আছে স্বাধীন ভারতে? স্বাধীনতার ৭৫ বছরে আত্ম-জিজ্ঞাসা— আমরা অগণিত শহিদের আকাঙ্খিত স্বাধীনতা পেলাম কি?

এ বিষয়ে বিস্তারিত এবং সমৃদ্ধ আলোচনা রেখেছেন শিবদাস ঘোষ, যিনি তাঁর কৈশোরেই স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় আপসহীন বিপ্লবী ধারার অনুশীলন সমিতির এই বিপ্লবী ২৫বছরের যুবক। যে স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়ে অগণিত যুবক ডিগ্রি, চাকরি, কেরিয়ার, ব্যক্তিজীবনে প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সব কিছু বিসর্জন দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তা ব্যর্থ হতে যাচ্ছে। স্বাধীনতার নামে যা প্রাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে তা যে শ্রমিক কৃষক ছাত্র যুবক তথা সাধারণ মানুষকে শোষণ থেকে মুক্তি দেবে না—ব্রিটিশের কারাগারে বন্দি অবস্থাতেই তিনি তা উপলব্ধি করেন। ১৯৪২-'৪৫ এই তিন বছর কারারুদ্ধ ছিলেন তিনি। কারাগারে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের নিবিড় চর্চার মধ্য দিয়ে তিনি উপলব্ধি করেন এতবড় মহৎ স্বাধীনতা সংগ্রাম কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারল না শ্রমিক শ্রেণির হাতে নেতৃত্ব না থাকার জন্যই। তিনি গান্ধীজির সংগ্রাম, তাঁর ত্যাগ, সততা, নিষ্ঠা সব কিছু স্বীকার করে নিয়েও বললেন, চিন্তার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান অনুসরণ না করার ফলে গান্ধীজি ধরতেই পারলেন না দেশটা যে শ্রেণিবিভক্ত—শোষক-শোষিতে বিভক্ত। ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামের ফসল কুক্ষিগত করল ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণি এবং তারাই ক্ষমতাসীন হল। এই অবস্থায় দেশীয় পুঁজিপতিদের শোষণ-নির্যাতন থেকে জনগণের মুক্তি চাই, এটাই হয়ে ওঠে শ্রমজীবী মানুষের সামনে সংগ্রামের প্রধান ধারা। এই উপলব্ধি থেকেই শোষণ মুক্তির নতুন সংগ্রামের জন্য তার উপযোগী কমিউনিস্ট দল গঠন করতে জেলের ভিতরেই তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম শুরু করেন তিনি। এই সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতার ৮ মাস পরেই শোষণ মুক্তির দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) গঠন করেন।

স্বাধীনতার পরপরই সিপিআই যখন বলছে, 'এ আজাদি ঝুটা হ্যায়', তখন শিবদাস ঘোষ তার সাথে একমত হতে পারেননি। বলেছেন, "স্বাধীনতা দেশে আসেনি—এ কথা আমরা বলতে চাইছি না, বা আমরা তা বিশ্বাসও করি না। আমরা মনে করি, দেশ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতার ত্রুটি-বিচ্যুতি, সীমাবদ্ধতা, দেশের শাসক গোষ্ঠীর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির প্রতি আনুগত্য ও নমনীয় মনোভাব, তাদের সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা নীতি, সামন্ততন্ত্রের সাথে আপসমুখী মনোভাব ও সর্বোপরি শাসনব্যবস্থাকে পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে পরিচালনা— এ সব সত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, দেশ রাজনৈতিক ভাবে স্বাধীন হয়েছে" *(১৫ই আগস্টের স্বাধীনতা ও গণমুক্তির সমস্যা, শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলি, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩)*।

পুঁজিপতিদের লক্ষ্য ছিল লুটের বাজার, শ্রমিক শ্রেণির ছিল মুক্তি

কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনে শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতাই তো জনগণের লক্ষ্য ছিল না। লক্ষ্য ছিল পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা অর্থাৎ, শোষিত না হওয়ার স্বাধীনতা, জাতিগত অবদমনের শিকার না হওয়ার স্বাধীনতা, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ থেকে মুক্তি, পুরুষের অধীনতা থেকে নারীর মুক্তি, মানুষ হিসাবে মাথা উঁচু করে মর্যাদা নিয়ে বাঁচার স্বাধীনতা— যাকে এক কথায় বলা হয় গণমুক্তি। তা আসেনি। তাই এই দিনটিকে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) পালন করে 'গণমুক্তি সংকল্প দিবস' হিসাবে। শিবদাস ঘোষ বলেছেন, "আমরা পার্টির তরফ থেকে স্বাধীনতা দিবসকে 'গণমুক্তি সংকল্প দিবস' হিসাবে পালন করে আসছি। ...তার কারণ, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা অন্যতম লক্ষ্য জনসাধারণের সামনে ছিল স্বাধীনতা লাভ ও সর্বপ্রকার শোষণ থেকে মুক্তি অর্জন। সেই উদ্দেশ্য, সেই লক্ষ্য বর্তমান স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক কাঠামো জগদ্দল পাথরের মতো আমাদের বুকের উপর চেপে বসেছে, তার দ্বারা পরিপূরিত তো হয়ইনি, উপরন্তু জনসাধারণের সে আশা-আকাঙ্খা রূপায়িত করার পথে তা আজ একটা প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই বাধা হঠাতে না পারলে শোষণ থেকে জনসাধারণের মুক্তি অসম্ভব" *(ওই, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩-২৪)*।

শোষণ মুক্তি বা গণমুক্তি কথাটিকে আরও ব্যাখ্যা করে শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন— "জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য লড়েছিল এই জন্য যে, ইংরেজকে না তাড়ালে এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না, যে সমাজে অন্যায়-অবিচার এবং পুঁজিবাদী জুলুম, ব্যবসাদারদের জুলুম, জমিদারদের জুলুম, ব্যুরোক্রেসির জুলুম— এই সমস্ত জুলুমের চিরতরে অবসান ঘটবে এবং যে সমাজে আমাদের সর্বাঙ্গীন মুক্তির সুযোগ, ব্যক্তির বিকাশের সমান সুযোগ, সমস্ত স্তরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগ, জনগণের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য সব রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ, আর সর্বাত্মকভাবে পরিকল্পনা অনুযায়ী আর্থিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে সামগ্রিকভাবে সমাজের কল্যাণ অর্থাৎ, জনগণের অর্থে সামগ্রিক কল্যাণের দ্বার খুলে দেওয়া যাবে"। *(ওই, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩-২৪)*। জনগণের সামনে স্বাধীনতার এই যে লক্ষ্য ছিল স্বাধীন পুঁজিবাদী ভারতে তা পূরণ তো হয়ইনি, বরং এই পুঁজিবাদ যত শক্তিশালী হচ্ছে, সংহত হচ্ছে এই সমস্ত সমস্যা আরও তীব্র হয়ে উঠছে।

স্বাধীনতার সুফল তা হলে পেল কারা? পেয়েছে ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণি। স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, ছাত্রযুবক লড়লেও, প্রাণ দিলেও কোনও দেশীয় পুঁজিপতি এদের মতো করে আন্দোলনে ছিল না। তারা ছিল আন্দোলনের সমর্থক মাত্র। এই সংগ্রামে জনসাধারণের আকাঙ্খার সাথে এই মালিক শ্রেণির আকাঙ্খার সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল। মালিক শ্রেণির একাংশ যে আন্দোলনে কখনও কখনও ফান্ড জোগাত, তার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে শিবদাস ঘোষ বলেছেন, "আমাদের দেশের এই তেতাল্লিশ কোটি লোক অধ্যুষিত যে লুটের বাজার, সেটি নিংড়ে নিয়ে তার পুরো রসটি নিয়ে যাচ্ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা, বিদেশি পুঁজিপতিরা। আর দেশীয় পুঁজিপতিরা ছিল তাদের ছোট হিস্যেদার। বিদেশি শাসনের জন্য এই বিরাট লুটের বাজারে ভারতবর্ষের পুঁজির অবাধ বিস্তার, শোষণ এবং লুণ্ঠনের বাজারটি তারা পাচ্ছিল না। তাই তাদের দরকার ছিল দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতাকে পাওয়া, শুধু রাষ্ট্রযন্ত্রটি ব্রিটিশের হাত থেকে নেওয়া..." *(ওই, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭)*। স্বাধীনতা বলতে পুঁজিপতি শ্রেণি এটিই বুঝেছিল। পুঁজিপতি শ্রেণির এই আকাঙ্খা পুরণ হয়েছে। তারা শোষণের স্বাধীনতা পেয়েছে। আর দেশের জনসাধারণ ব্রিটিশের শোষণের স্থলে দেশীয় পুঁজিপতিদের শোষণের মধ্যে পড়েছে। ১৫ আগস্টের স্বাধীনতা ব্রিটিশের কবল থেকে মানুষকে মুক্ত করলেও দেশীয় পুঁজিপতিদের শোষণের শৃঙ্খলে পুনরায় বন্দি করেছে। এখানেই বুর্জোয়া নেতৃত্বাধীন স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যর্থতার ছায়া।

ভারতে জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠার প্রেক্ষাপট

এই ব্যর্থতা কি অনিবার্য ছিল? এরও উত্তর খুঁজেছেন শিবদাস ঘোষ। কী ভাবে ভারতে দেশাত্মবোধ গড়ে উঠল, জাতীয়তার উন্মেষ হল, সেই জাতীয়তার মধ্যে দুর্বলতার দিক কোথায় ছিল এবং কেন, তার ফলে স্বাধীনতা আন্দোলনে কী ক্ষতিকর প্রভাব পড়ল, এ ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের কী ভূমিকা নেওয়া দরকার ছিল, তার নানা দিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তিনি। তিনি বলেছেন, "ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রেই জানেন যে, পুঁজিবাদের বিকাশের পথেই সমস্ত আধুনিক জাতিগুলির (নেশনস) ও জাতীয় রাষ্ট্রগুলির (ন্যাশনাল স্টেটস) সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতীয় জাতীয়তার উন্মেষ ও বিকাশও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। আজ যাকে আমরা দেশাত্মবোধ বলছি, এরূপ দেশাত্মবোধের সৃষ্টি বেশি দিনের কথা নয়। অতীতের ভারতবর্ষে এরূপ দেশাত্মবোধ ছিল না। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় তা সম্ভবও নয়। একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে জাতীয় পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশ না হলে এরূপ দেশাত্মবোধের সৃষ্টি হতে পারে না। ভারতবর্ষ সমস্ত উপজাতিগুলিকে (ন্যাশনালিটিস) মিলিয়ে একটা আধুনিক জাতি (নেশন) হিসাবে গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় ঢুকেছে সারা দেশ জুড়ে একটি কেন্দ্রীয় ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পরে। এ সময় থেকেই একটি আধুনিক কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা পরিচালনার প্রয়োজনে সারা দেশ জুড়ে রেল ও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার বিস্তৃতি ঘটতে থাকে এবং তারই ফলে ধীরে ধীরে স্থানীয় গ্রামীণ অর্থনীতিতে ভাঙন শুরু হয় এবং বিভিন্ন উপজাতীয় অর্থনীতিগুলিকে মিলিয়ে সারা দেশ জুড়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের কাঠামো (ট্রেড অ্যান্ড কমার্স সিস্টেম) গড়ে উঠতে থাকে। এই পথেই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে একটি জাতীয় বাজারের সৃষ্টি হতে থাকে এবং জাতীয় পুঁজি জন্ম নেয়। আধুনিক যানবাহন ব্যবস্থার বিস্তৃতি লাভ, বিভিন্ন উপজাতীয় অর্থনীতির মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিনিময়, একটি জাতীয় বাজারের সৃষ্টি ও পুঁজিবাদের বিকাশ ভারতবর্ষে সমস্ত উপজাতিগুলির মধ্যে একটি সমস্বার্থবোধ এনে দেয়। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক এই সমস্বার্থবোধই গোটা

সাতের পাতায় দেখুন

হরিয়ানায় সরকারি স্কুল বন্ধ করছে বিজেপি সরকার
প্রতিবাদ এআইডিএসও-র

ছাত্রসংখ্যা কমে যাওয়ার অজুহাতে হরিয়ানার বিজেপি সরকার গত কয়েক বছরে শতাধিক সরকারি স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে। এআইডিএসও-র হরিয়ানা রাজ্য সভাপতি হরিশ কুমার এ প্রসঙ্গে বলেন, সরকারকে প্রশ্ন করতে চাই সরকারি স্কুলের এই করুণ পরিণতি র জন্য দায়ী কে? প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা চালু না থাকার সরকারি নীতির জন্যই ছাত্ররা বেসরকারি স্কুলে ভর্তি হতে বাধ্য হচ্ছে।

বছরের পর বছর সরকারি স্কুলগুলি বিপুল সংখ্যক শিক্ষক-পদ শূন্য পড়ে থাকা, ক্লাসঘরগুলির ভগ্নদশা,পানীয় জল-শৌচালয়-লাইব্রেরি-খেলাধূলার সামগ্রী না থাকার কারণে ধুঁকছে। তার উপর শিক্ষকদের পড়াশোনা-বহির্ভূত কাজে ব্যস্ত রাখা হয়। ক্লাস চালু হওয়ার পর ছয় মাস পার হয়ে গেলেও স্কুলে ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হয় না। এই সবকিছুর জন্য তো সরকার নিজেই দায়ী। সরকারি স্কুলে নিরুপায় গরিব ও শ্রমিক পরিবার থেকেই ছাত্ররা ভর্তি হয়। কংগ্রেস সরকারের মতোই বর্তমানে বিজেপির খট্টর সরকার শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের নীতি দ্রুততার সাথে কার্যকর করতে সরকারি স্কুল পুরোপুরি বন্ধ করার পথে হাঁটছে। তার উপর জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ চালু হওয়ার পর সরকারি শিক্ষার যতটুকুও মান ছিল তাও ধ্বংসের পথে।

এই অবস্থায় সাধারণ জনগণ সহ ছাত্র ও শিক্ষক সমাজের কাছে এআইডিএসও-র আবেদন, সরকারি স্কুল বন্ধ করা, শিক্ষক পদ বিলোপ ও বেসরকারিকরণ নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হোন।

বন্যার্তদের চিকিৎসায়
ওড়িশায় মেডিকেল ক্যাম্প

ওড়িশার ভয়াবহ বন্যা কবলিত এলাকায় মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার ও এআইডিএসও-র উদ্যোগে চিকিৎসা শিবির। ২৭ আগস্ট

মিড-ডে মিলে মাথাপিছু ২০ টাকা বরাদ্দের দাবি বিপিটিএ-র

মিড-ডে মিলে মাথাপিছু ২০ টাকা বরাদ্দ সহ ৫ দফা দাবিতে ২৪ আগস্ট বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হাণ্ডা এবং কলকাতা জেলা সম্পাদিকা সুমিতা মুখার্জির নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবনে ডেপুটেশন দেন।

মিড ডে মিলে ছাত্রপিছু বরাদ্দ প্রাথমিকে মাত্র ৪.৯৭ টাকা এবং উচ্চপ্রাথমিকে ৭.৪৫ টাকা। বর্তমানে সমস্ত জিনিসপত্রের সঙ্গে গ্যাসের দাম প্রতিদিন যেভাবে বাড়ছে, তাতে ওই সামান্য টাকায় মিড-ডে মিলের খরচ চালাতে শিক্ষকদের নাভিশ্বাস উঠছে। পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া তো দূরের কথা। পাশাপাশি মিড-ডে মিল ওয়ার্কারদের অবস্থাও চরম সঙ্কটে। ৫০ জন ছাত্র পিছু ১ জন হিসেবে তাদের মাত্র ১৫০০ টাকার বিনিময়ে কাজ করানো হয়। তাও গ্রীষ্মের ছুটি ও পুজোর ছুটির সময়ে সামান্য এই ভাতাটুকুও দেওয়া হয় না। আরও অমানবিক বিষয় হল, যাঁরা রান্না করেন, সেই রাঁধুনিদের জন্য পর্যন্ত কোনওরকম খাদ্যের বরাদ্দ নেই।

সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হাণ্ডা বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে নাকি উন্নয়নের প্রতিযোগিতা চলছে! অথচ ক্ষুধা তালিকার শীর্ষে ভারত, যেখানে প্রতি ৩ জন শিশুর ১ জন অপুষ্টিতে ভুগছে। তা সত্ত্বেও করোনাকালে ছাত্র-ছাত্রীদের মিড-ডে মিলের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তিনি অবিলম্বে করোনাকালের প্রাপ্য বকেয়া অর্থ ও চাল ছাত্র-ছাত্রীদের ফেরত দেওয়ার দাবি জানান। পাশাপাশি মিড-ডে মিলে মাথাপিছু ২০ টাকা বরাদ্দ, পৃথকভাবে গ্যাস বা জ্বালানির বরাদ্দ, ৫০ জনের কম ছাত্রযুক্ত বিদ্যালয়ের জন্য বিশেষ বরাদ্দ সহ মিড-ডে মিল ওয়ার্কারদের সমস্যা সমাধানের দাবি জানান।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে কৃষ্ণনগরে অবরোধ

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর শহরের গুরুত্বপূর্ণ, ব্যস্ততম ডি এল রায় রোডে দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে অসংখ্য খানা খন্দের সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিদিন কোনও না কোনও দুর্ঘটনা এবং মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। ২৩ আগস্ট এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) কৃষ্ণনগর লোকাল কমিটির উদ্যোগে স্থানীয় সাধারণ মানুষের সক্রিয় সহযোগিতায় রাস্তা অবরোধ হয়। অবরোধ চলাকালীন আইসি-র নেতৃত্বে বিরাট পুলিশ বাহিনী উপস্থিত হয় এবং আন্দোলনকারীদের ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এই ঘটনায় স্থানীয় মানুষ প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়। ফলে পুলিশ পিছু হটে। আইসি পরে আগামী সাত দিনের মধ্যে রাস্তা সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেন। পরে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

তাই এত তোয়াজ

একের পাতার পর

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির হাল তলানিতে। মূল্যবৃদ্ধি আকাশ ছুঁয়েছে। কোভিডের আক্রমণ এবং লকডাউনে বিরাট সংখ্যক মানুষ রোজগার হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। জনজীবনের অপরিহার্য বিদ্যুতের দামের জন্য বহু মানুষ তা ব্যবহার করতে পারছে না। স্কুলগুলিতে শিশুদের খাবারের জন্য বরাদ্দ হাস্যকর রকমের কম। হাসপাতালগুলিতে বরাদ্দ যৎসামান্য, ওষুধের সংখ্যাও কমিয়ে চলেছে সরকার। এসব প্রতিটি ক্ষেত্রে সরকার বলছে, 'টাকা নেই'। অথচ, পুজো কমিটিকে টাকা দেওয়ার ঘোষণার সময় মুখ্যমন্ত্রী বললেন, 'আমার ভাঁড়ার শূন্য। মা দুর্গা ভাঁড়ার ভর্তি করবেন আশা করি।' মুখ্যমন্ত্রীর এমন আশা শুধু পুজো কমিটিগুলিকে টাকা দেওয়ার বেলাতেই কেন? এই ধরনের আজগুবি কথা বলার আগে মুখ্যমন্ত্রী একবারও ভাবলেন না যে, রাজ্যে কর্মসংস্থানের কী ভয়ানক দুর্দশা! বেকারে রাজ্য ছেয়ে গেছে। যোগ্য প্রার্থীরা রাস্তায় বসে রয়েছেন প্রায় দু বছর ধরে। অথচ বছর বছর এই পরিমাণ সরকারি টাকায় কতজনের স্থায়ী কর্মসংস্থান হতে পারে সে হিসেবটাও মুখ্যমন্ত্রী করলেন না। উদাহরণ হিসেবে, বছরে ২৫৮ কোটি অনুদান যদি বন্ধ করা হয়, তা হলে সেই টাকায় মাসে ২০ হাজার টাকা বেতনে ১০/১১ হাজার জনের স্থায়ী চাকরি হয়। অথচ, এই পথে সরকার হাঁটছে না।

কেন হাঁটছে না? কারণ ভোটসর্বস্ব অন্য দলগুলির মতোই তৃণমূল সরকারেরও আসল লক্ষ্য— জনগণের দুর্দশাগুলি লাঘবের দুরূহ চেষ্টার পরিবর্তে সস্তা জনপ্রিয়তার রাজনীতিতে জনগণের সমর্থন আদায় করা। বছরে ১০ হাজার জনের স্থায়ী চাকরির থেকেও ৪৩ হাজার পুজো কমিটির সঙ্গে যুক্ত লক্ষ লক্ষ সদস্যের সমর্থন পাওয়া সেই লক্ষ্যেরই অংশ। যে কমিটিগুলি এই টাকা পাবে তারা স্বাভাবিক ভাবেই শাসক দলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে বাধ্য হবে। এই সব কমিটি, ক্লাবের সদস্যরাই গত কর্পোরেশন, পৌরসভা কিংবা পঞ্চায়েত নির্বাচনে যেমন নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করেছে, তেমনই দেদার ছাপ্পা ভোট দিয়ে শাসক দলকে ক্ষমতা ধরে রাখতে সাহায্য করেছে। ভোটসর্বস্ব এই সব দলগুলির নীতিহীন রাজনীতি আজ যে পর্যায়ে নেমেছে তাতে জনস্বার্থে কাজ করে মানুষের সমর্থন আদায় করার সময়সাপেক্ষ, অপেক্ষাকৃত কঠিন রাস্তায় হাঁটার চেয়ে এমন সস্তা রাস্তা নেওয়াতে তারা আর বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করে না। এ তাদের দেউলিয়া রাজনীতিরই স্পষ্ট পরিচয়। এই ভাবেই এই সব দল সাধারণ মানুষের মৌলিক সমস্যাগুলিকে পিছনে ঠেলে দিয়ে গুরুত্বহীন বিষয়গুলিকে সামনে নিয়ে এসে হইচই বাধিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।

ক্লাবগুলি, যারা দীর্ঘদিন ধরে স্বাধীন ভাবে কাজ করে এসেছে, তারাই আজ শাসক দলের অনুদানের প্রলোভনে নিরপেক্ষতা বিসর্জন দিয়ে শাসক দলের ধামাধরা হয়ে পড়ছে। শাসক দলের নেতারা যত দুর্নীতিগ্রস্তই হোন, তবুও তাঁদেরই এই সব ক্লাব এবং কমিটিগুলি আজ প্রেসিডেন্ট কিংবা প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে।

তৃণমূলের এক নেতা বলেছেন, "দুর্গাপুজো আজ বাংলার গণ্ডি, দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। ইউনেস্কো স্বীকৃতি দিয়েছে। এত হাজার পুজো কমিটিকে মুখমন্ত্রী যেভাবে আর্থিক সাহায্য করেছেন, সেটা কোনও সরকার করতে পারেনি। ভাবটা এমন যেন সরকার একটা বিরাট কাজ করেছে? ইউনেস্কো দুর্গাপুজোকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ভাল কথা। কিন্তু ইউনেস্কো দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়েও তো উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বিশেষত, স্কুলগুলিতে শিক্ষকের অভাব (পশ্চিমবঙ্গে ১.১ লক্ষ শিক্ষকের শূন্যপদ রয়েছে), পরিকাঠামোর অভাব নিয়ে যে পরিসংখ্যান ইউনেস্কো জানিয়েছে, সেগুলি নিয়ে তো এই সব নেতামন্ত্রীদের কোনও উদ্বেগ দেখা গেল না?

শারদোৎসব বহু কাল ধরে বাংলায় হয়ে এসেছে। তৃণমূল কংগ্রেস সরকার না থাকলেও তা হবে। উৎসবকে ভোট রাজনীতির হুল্লোড়ে পরিণত করা কি এই উৎসবের ঐতিহ্যের সঙ্গে মেলে? তা ছাড়া সরকারের কাজ কি পুজো কমিটিগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া? এটি কি জনস্বার্থের মধ্যে পড়ে? এটি কি ধর্মীয় উৎসবকে কৌশলে ভোট রাজনীতির কাজে ব্যবহার নয়? সরকারি কোষাগারের বৃহদংশ খেটে খাওয়া মানুষের কষ্টার্জিত টাকা। সেই খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ চায় না তা কেউ ইচ্ছামতো অপব্যয় করুক, তা দিয়ে কোনও ভাবেই তোষণমূলক কাজ করুক। অবিলম্বে সরকার জনগণের টাকার এমন অপব্যয় বন্ধ করুক।

ভারতের প্রথম লোহার খনি অঞ্চল আজও চূড়ান্ত অবহেলিত

ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ ভারতের মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছে লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, বক্সাইট খনিজ আকরিক সমৃদ্ধ এলাকা হিসাবে। অথচ এই এলাকার মানুষের সমৃদ্ধির ছবি শত খুঁজেও পাওয়া যায় না। চূড়ান্ত দারিদ্রপীড়িত এই অঞ্চলের মানুষের হাড়জিরজিরে ছবি দেখলে আফ্রিকার কোনও দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশের কথা মনে এসে যায়।

দ্রৌপদী মুর্মু রাষ্ট্রপতি হওয়ায় ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার রাইরঙ্গপুর কিছুটা হলেও প্রচারের আলোতে এসেছে। অথচ এই অঞ্চলটি এক শতাব্দীরও বেশি আগে থেকে লৌহ আকরিক সহ নানা খনিজ দ্রব্যের ভাণ্ডার হিসেবে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। আদিবাসী অধ্যুষিত এই এলাকায় খনিজ সম্পদকে কেন্দ্র করে বিশাল শিল্পাঞ্চলও গড়ে ওঠে সে সময়। তা সত্ত্বেও অশিক্ষা, দারিদ্রের অন্ধকারেই ডুবে রয়েছে গোটা এলাকা।

বর্তমান রাষ্ট্রপতি এবং পূর্বতন বিজেপি বিধায়ক দ্রৌপদী মুর্মুর বাড়ি রাইরঙ্গপুরে। ২০০০ সালের আগে থেকেই তিনি ছিলেন বিজেপির নেতা। ২০০০-০৯ দীর্ঘ দশ বছর রাইরঙ্গপুরে বিজেপির বিধায়ক থাকা সত্ত্বেও এলাকার মানুষের জীবনযাত্রা উন্নয়নে কোনও পদক্ষেপ নেননি তিনি।

রাইরঙ্গপুর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত গরুমহিষানিতে রয়েছে ভারতের প্রথম লৌহ আকরিক খনি। টাটা স্টিলের অধীনস্থ এই খনিটি ইস্পাত ব্যবসার জগতে 'মাদার মাইন' হিসেবে পরিচিত। এখানে প্রতি বছর ৩৪ মিলিয়ন টন লোহা উৎপন্ন হয়। ১৯০৪ সালে এই লৌহ আকরিক থেকে লোহা নিষ্কাশনের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়, পরে জামসেদপুরে টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি তৈরি হয়। গরুমহিষানি পাহাড়ে লোহার খনি থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের দারিদ্র ঘোচেনি। ওড়িশায় দীর্ঘদিন শাসন ক্ষমতায় থাকা বিজেপি সমর্থিত বিজেডি সরকার এলাকাবাসীর অর্থনৈতিক মান উন্নয়নে কোনও চেষ্টাই করেনি। বাইরে থেকে কারখানায় কিছু শ্রমিক নিয়োগ করেছে। দরিদ্র, আর্থিক দিক থেকে দুর্বল স্থানীয় মানুষ কতটুকু সুযোগ পেয়েছে?

১০০ বছরের পুরনো এই খনি শহরে টাটা গোষ্ঠী ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য তৈরি করেছে রেললাইন, রোপওয়ে, জলাধার, স্কুল-কলেজ। এই শহরের সাথে খনি এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে যে এখানকার প্রথম কলেজের নাম আয়রন কলেজ। অথচ শিল্পাঞ্চল এলাকার জল সরবরাহ ব্যবস্থা থেকে খাদ্যের জোগান দেওয়া, তাকে ঘিরে থাকা যে গ্রামগুলি তাদের উপর দিয়ে বিদ্যুতের তার, রেলের লাইন গেলেও সেগুলিতে উন্নয়নের আলো পৌঁছয়নি। প্রবীণদের অভিজ্ঞতা, সেই সময় ওড়িশায়, এমনকি সারা ভারতে খুব কম জায়গাতেই প্যাসেঞ্জার ট্রেন চলত। গরুমহিষানিতে ১৯১১ সাল থেকে প্যাসেঞ্জার ট্রেন চালু হয়। খনি অঞ্চলে বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু করে টিসকো। বলা বাহুল্য, রেল, স্কুল, কলেজ, বিদ্যুৎ— এ সব পরিষেবা পুঁজিপতি টাটা ওড়িশার গরিব জনসাধারণের প্রয়োজনে করেনি। নিজেদের ব্যবসাকে সম্প্রসারিত করতেই তারা এ সমস্ত করেছিল, যাতে শ্রমিকরা তাদের পরিবার নিয়ে এখানে বাস করে কারখানায় তাদের শ্রম নিংড়ে দিতে পারে।

শ্রমিক-জোগানদার এবং খনির কন্ট্রাকটর হিসেবে এখানে কাজ করতেন রুদ্র নারায়ণ মহান্তি। বললেন, পাঁচ হাজারের বেশি শ্রমিক গরুমহিষানিতে কাজ করতেন। আগে তাঁদের রেশন— চাল, গম, কয়লা, কাঠ এবং জল দেওয়া হত নিয়মিত। তখন তাঁরা কিছুটা স্বচ্ছন্দেই জীবন যাপন করতেন। খনিতে একসময় কাজ করতেন ৯০ বছরের আশা মহাকুদ। তিনি বলেন, 'আমার ঠাকুমা টিসকোর খনিতে কাজ করতেন এবং যন্ত্রপাতি ছাড়াই লৌহ আকরিকের টুকরো বাছাই করতেন। আমার বাবাও কাজ করতেন। কারখানায় আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারে আমার কাজ চলে যায়।' বংশপরম্পরায় খনিতে কাজ করেই মহাকুদ পরিবার স্বচ্ছন্দে জীবন যাপনের জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করে চলেছে। ১৯৪০-৫০ সালে খনি শ্রমিক আশা মহাকুদ দিনে ১-২ টাকার বিনিময়ে কাজ করতেন, এখন বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর দিন গুনছেন। এরকম অবস্থা অসংখ্য শ্রমিকের। অথচ প্রায় প্রতিটি রাজ্যে টাটা স্টিল, টাটা মোটরসের কারখানা রমরমিয়ে চলছে। দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশের বাজারেও টাটা মোটরসের ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠেছে।

স্থানীয় মানুষ টাটা গোষ্ঠীর কাছে এলাকা উন্নয়নের দাবি জানিয়েছেন বারবার। টাটা গোষ্ঠীর তৎকালীন কর্ণধার কিংবা বর্তমান কর্তারা শ্রমিকদের দিয়ে আকরিক লোহা তোলার কাজ করিয়ে বিপুল মুনাফা করছেন। কারখানার দিনে দিনে শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে শ্রমিকের ঘাম-রক্ত ঝরা শ্রমের বিনিময়েই। কিন্তু শতাব্দী প্রাচীন এই লৌহ আকরিক কারখানার শ্রমিক এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলের জনসাধারণের জীবন মানের উন্নয়ন হয়নি এতটুকুও। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে এটাই প্রাপ্তি (!) তাদের।

(সূত্র ঃ দ্য হিন্দু, ২২ জুলাই, ২০২২)

শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষ

একের পাতার পর

চলতে পারে। কাজেই যে কমরেডটি প্রশ্ন করেছিলেন বিপ্লব ছাড়া হবে না বুঝি অথচ এসব আমি তো করতে পারি না, তিনি আসলে বিপ্লবী হওয়ার জন্য যে মৌলিক দিকগুলোর কথা বললাম— যে পরিষ্কার প্রশ্নগুলো তার সামনে থাকা দরকার, যেটার মধ্যে তত্ত্বের এত ঝঞ্ঝাট নেই, এত আলোচনা করার বিষয় নেই, সোজা বলতে হবে আমি পারি কি পারি না। এই পারি না-র মধ্যে যদি আমার বোঝার গণ্ডগোল থাকে আমি বুঝে নেব।

অনেক কর্মীর খুব আবেগ থাকে। প্রথমে যখন তারা বোঝেন যে, একটা কিছু করা দরকার, আই শুড ডু সামথিং, আমি কিছু করব। এইরকম ফ্রেস মাইন্ড নিয়েই প্রথমে আসেন। বহু ঝড় ঝাপটা ধাক্কাধাক্কির ব্যাপার আছে। তিনি গিয়ে প্রবল উৎসাহে একটা অলীক ভাবনা ভেবে নিলেন যে আমি গিয়ে খুব উৎসাহের সাথে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই জনগণ সাড়া দিতে শুরু করবে। আর এই সাড়া না পেলেই ফ্রাসট্রেশন আসে। আসলে কাজ করবার সঙ্গে সঙ্গে বোঝার স্তরকেও উন্নত করতে হয়। আমি কাজ করে যাচ্ছি এটা বড় কথা নয়। আমি যথার্থই একটা সেকশন অফ পিপলের নেতা হতে পেরেছি কি না— যে সেকশন অফ পিপল আমার মুখ চেয়ে বসে আছে। আমার নিজের যাই কিছু দুঃখবেদনা, কষ্ট, সুবিধা-অসুবিধা থাকুক, আমার আত্মমর্যাদার জন্য, তাদের কাছে আমার সম্ভ্রম, সম্মান রক্ষার জন্য আমাকে তাদের জন্য না করে উপায় নেই। আমার মাথা তা হলে লুটিয়ে যাবে। আমি এইভাবে তাদের কাছে প্রতিষ্ঠিত। তাদের আমি ঘরবাড়ি ছাড়িয়েছি। তাদের আমি অনেক কথা বলে উদ্বুদ্ধ করে সংগ্রামে নিয়ে এসেছি। তারা আমার মুখ চেয়ে বসে আছে। এই অবস্থাটি সৃষ্টি করা হচ্ছে একটা গ্যারান্টি টু সেভ ইউ ফ্রম ফ্রাসট্রেশন।

এই যে প্রথম প্রথম অনেক আবেগ থাকে, পরের দিকে অতটা থাকে না কেন, এ বোঝার মধ্যে কী এত জটিলতা আছে? থাকে না এই কারণে যে, প্রথমে সে যখন আসে তখন সে একটা ভাসাভাসা কল্পনা, একটা রোমান্টিক আবেগ নিয়ে আসে। পরে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে সে ঘা খেতে থাকে। তার লড়াইয়ের শক্তিকে যদি সে ক্রমাগত তেমন করে বাড়াতে না পারে তা হলে তার ভাটা পড়বে। দুটো শক্তি— একটা তার সাংগঠনিক শক্তি, জনতার মধ্যে থাকা, তাকে সংগঠিত করা, তাকে লিড করবার শক্তি; আর একটা তার আদর্শ এবং চেতনার স্তর ক্রমাগত উন্নত করা। এই দুটি জিনিসকে যদি সে তালে তালে তার সঙ্গে বাড়াতে না পারে তা হলে তার ভাটা পড়বেই। এমন নয় যে সকলেরই ভাটা পড়ে। তা হলে না হয় একটা বিচার্য বিষয় ছিল। একদলের ভাটা পড়ে। আর আজকাল দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগেরই ভাটা পড়ে। কিন্তু যে কমসংখ্যক লোকের ভাটা পড়ে না, ক্রমাগত আরও ধারালো হয়, সেটা তা হলে কী করে হয়? সেখানে খুঁজলেই তো উত্তরটা পাওয়া যাবে। এরকমও তো কিছু অল্পসংখ্যক কর্মী আছে যারা প্রবল উৎসাহ নিয়ে এসে দীর্ঘদিন দলে নানা ক্রাইসিসের মধ্যে, জটিল অবস্থার মধ্যে, ঘা খাওয়া সত্ত্বেও তাদের চেতনা আরও উন্নত হয়েছে, দৃষ্টিশক্তি আরও পরিচ্ছন্ন হয়েছে, কর্মক্ষমতা ও উদ্যোগ আরও বেড়েছে এবং ডিটারমিনেশন আরও বেড়েছে। তা এরকম একটা সংখ্যা আছে। কিন্তু বেশিরভাগের ভাটা পড়ছে। ওই যে অল্পসংখ্যক কর্মীর কথা বললাম যাদের ভাটা পড়েনি, তারা লড়াই করবার সাথে সাথেই, লড়াইয়ে নামবার সাথে সাথেই বাস্তবের ঘা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেকে দ্রুত একদিকে রাজনৈতিক চেতনার দিক থেকে, দর্শনগত উপলব্ধির দিক থেকে, রুচি-সংস্কৃতি-মানসিক গঠন পরিবর্তন করার দিক থেকে, নিজেকে ভেঙে নতুন করে গড়া, আর অপরদিকে জনসাধারণের মধ্যে থাকা, তাদের আন্দোলন পরিচালনা করা, তাদের সাথে জীবনটাকে মিলিয়ে দেওয়া, তাদের যথার্থ নেতা হওয়ার চেষ্টা করা— এই দুটো একসঙ্গে প্রবলভাবে করেছে। আর আর একদল কাজ করতে এসেছে প্রবল উৎসাহে কিন্তু করেছে রুটিন ওয়ার্ক, কখনও পাবলিককে অর্গানাইজ করার চেষ্টা করে তাদের নেতা হতে পারেনি। এই না পারার জন্য তাদের এই ফ্রাসট্রেশন, এই ভাটা পড়া। খালি না পারার জন্য নয়, তার সাথে সাথে আদর্শগত, রুচিগত ও মানসিক কাঠামোর মধ্যে চাওয়া-পাওয়ার নানা দিক যেগুলো থাকে সেগুলো বিপ্লবমুখী করে ভেঙে নতুন করে গড়ার কাজটিও তার হয়নি। সিম্পলি উপর থেকে বুদ্ধি দিয়ে বিপ্লবটা গ্রহণ করে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে কয়েক দিন ঝড়ের মতন কাজ করল। করে দেখলো কোথাও কিছু হচ্ছে না, শুধু তার পরিশ্রমই সার। সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ থিতিয়ে পড়তে শুরু করল। এর মধ্যে তো বিশেষ একটা রহস্যজনক তত্ত্ব নেই যে এর একটা উত্তর করতে হবে। যে মানুষ বিপ্লবী সংগ্রামে কাজ করতে আসবে তাকে একই সঙ্গে জানতে হবে এটা একটা দুরূহ সংগ্রাম, এর উত্থান-পতন, ঘাতপ্রতিঘাত, বহু জিনিস রয়েছে। এই সংগ্রামটাই জীবন। এই জীবনে ফেলিওর হোক, সাকসেস হোক, এর মধ্যেই আমার মর্যাদাসম্পন্ন জীবনযাপনের পথ নিহিত, তা ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই। আর যত ভাবেই তুমি যুক্তি কর না কেন, আর সব হল ফাঁকির রাস্তা। এই হল প্রথম উপলব্ধি।

দ্বিতীয়ত হচ্ছে, এখানে টিকে থাকতে হলে শুধু ইচ্ছার দ্বারা, সততার দ্বারা টিকে থাকতে পারবে না। আজ যত প্রবল ইচ্ছাই থাকুক, সততাই থাকুক, ত্যাগ করার ক্ষমতাই থাকুক, দীর্ঘদিন এই কঠিন সংগ্রামে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে আমাকে টিকে থাকতে হলে আমার রাজনৈতিক চেতনা, চরিত্রের গঠন পাল্টে ফেলতে হবে এই লড়াইয়ের মধ্যে। আর আমার সীমিত ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র হলেও একটা সেকশন অফ পিপলের যথার্থ নেতায় পর্যবসিত হতে হবে।"

(**'বিপ্লবী জীবনই সর্বাপেক্ষা মর্যাদাময়' ঃ শিবদাস ঘোষ**)

ফালাকাটায় পার্টির নতুন অফিস

২৮ আগস্ট আলিপুরদুয়ার জেলার সুভাষপল্লীতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) ফালাকাটা লোকাল কমিটির কার্যালয় উদ্বোধন হল। উদ্বোধন করেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড শিশির সরকার। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক কমরেড অভিজিৎ রায়, কোচবিহার জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর প্রবীণ সদস্য কমরেড শঙ্কর গাঙ্গুলি।

পাঠকের মতামত

আদালতে দুই দৃশ্য

আদালত এমন একটি স্থান যেখানে মানুষের দুঃখ যন্ত্রণা হাহাকার অনেক কিছু মিশে থাকে। যেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার মামলা মোকদ্দমা নথিভুক্ত হয়। আবার সেই মামলা মোকদ্দমার একদিন না একদিন বিচারের রায় ঘোষিত হয়। আর আমাদের মতো রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্মীদের কাছে এই নিম্ন আদালতের মুখোমুখি হওয়া রাজনৈতিক সংগ্রামের একটা অংশ। বহু সময় গণতান্ত্রিক দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় দমন পীড়নের শিকার হয়ে আন্দোলনের কর্মীদের এই আদালতেই রাষ্ট্রের সাথে একপ্রকার আইনি যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়।

কয়েক দিন আগে কোচবিহারের হলদিবাড়ি কলেজে ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে এআইডিএসও-র ছাত্র আন্দোলনে পুলিশি জুলুমের প্রতিবাদে এস পি অফিসে স্মারকলিপি দিতে গেলে ৪ জন ছাত্রী সহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, নারীনিগ্রহ সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মিথ্যা মামলা দায়ের করে। তাদের ১০ দিন জেল হেফাজত দেওয়া হয়। আন্দোলনকারী ১৩ জনের মুক্তির দাবিতে কলকাতায় ২৩ আগস্ট আমরা প্রতিবাদ জানিয়ে মিছিল ও পথ অবরোধ করি। পুলিশ সেখানেও একইভাবে লাঠি চালায় এবং ৮২ জনকে গ্রেফতার করে এবং মিথ্যা মামলা দায়ের করে পুলিশের সদর দফতর লালবাজারে নিয়ে যায়। সন্ধ্যা ৭ টার পর ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন দিলেও এমনভাবে মামলা সাজানো হয় যাতে আদালতে হাজির হয়ে চূড়ান্ত জামিন নিতে হয়।

২৫ আগস্ট ছিল সেই চূড়ান্ত জামিন নেওয়ার দিন। সেইমতো ৮২ জন কর্মী কলকাতা নগর দায়রা আদালতে (ব্যাঙ্কশালকোর্ট) উপস্থিত হই। এই মামলার খরচ ও জামিনের অর্থের জন্য আমরা আদালতে উপস্থিত আইনজীবী, ল-ক্লার্ক সহ সকল মানুষের কাছেই সাহায্য চাই। বহু আইনজীবী, ল-ক্লার্ক, ইন্টার্নশিপে থাকা আইনের ছাত্র আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এক আইনজীবী মন্তব্য করেন, 'এটা তো দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা-মন্ত্রীদের জায়গা। এখানে তোমরা কেন?' আমাদের আবেদন শোনার পর আর্থিক সাহায্য করে তিনি বলেন, 'তোমরাই জিতবে!'

আদালত চত্বরে বটতলা থেকে ডানদিকে এগিয়ে অতিরিক্ত বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট কক্ষে একজন বয়স্ক বিচারপ্রার্থী মহিলা দাঁড়িয়ে। মুখ দেখে তাঁকে যথেষ্ট বিচলিত এবং ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। আমাদের কথা শোনার পর ৫০ টাকা বের করে দিয়ে বললেন, 'আমি এটুকুই পারব'। আমাদের প্রচার শেষ হওয়ার পর সেই জায়গায় ওই মহিলাকে দেখি দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, 'কিছু হয়েছে মাসীমা?' তিনি এক নিঃশ্বাসে বলতে থাকেন, 'কী আর করব, স্বামী অনেকদিন আগেই চলে গেছেন। এখন ছেলে-বউয়ের সাথে ঘরের মালিকানা নিয়ে এখানে লড়তে এসেছি। একটা করে ডেট পাই, আর আসি। কিন্তু কিছুই ফয়সালা হয় না।' মনে পড়ে যায় আমার পরিচিত এক স্কুল শিক্ষিকার কথা যিনি 'মানুষের গন্ধ মাখার গল্পে' বলেছিলেন, 'অদ্ভুত মানুষের মন...অদ্ভুত তার চলন! নেই নেই কিছু নেই..তবুও তো আছে কিছু...' হ্যাঁ, আছে। এত নেইয়ের মাঝেও অনেক কিছু আছে! সত্যিই মানুষের প্রাণ আছে, যার স্পর্শে হাজার হাজার প্রাণ জেগে ওঠে। মানুষের গন্ধ আছে। সেই গন্ধ মেখে জীবনের জন্য ডানা মেলে উড়ে যাওয়া যায়।

সৌপ্তিক পাল
কলকাতা

৯ বছরের ছেলেটা 'স্বাধীনতা'র মানে বুঝল রক্তের নোনতা স্বাদে

স্বাধীনতার ৭৫ বছর যেদিন পালিত হচ্ছে মহা ধুমধামে, তার ঠিক আগের দিন অত্যাচারের দগদগে ক্ষত নিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল ইন্দ্র মেঘওয়াল, রাজস্থানের ৯ বছরের এক স্কুল-ছাত্র। দলিত পরিবারের সন্তান ইন্দ্রের অপরাধ, তেষ্টা পাওয়ায় সে উচ্চবর্ণের জন্য নির্দিষ্ট কলসি থেকে জল খেয়ে ফেলেছিল। উচ্চবর্ণের শিক্ষক প্রচলিত প্রথায় তাকে সবক শেখাতে নির্বিচারে চড়-থাপ্পড় মারায় ছিঁড়ে গেল কানের শিরা। স্বাধীনতা দিবসে স্কুলের বন্ধুদের সাথে তেরঙা পতাকা তোলার সাক্ষী হওয়া আর হল না ইন্দ্রের। ১৫ দিন নানা হাসপাতাল ঘুরে অবশেষে ১৪ আগস্ট আহমেদাবাদের এক হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে তার পাঞ্জা কষা শেষ হল।

একবিংশ শতকে দাঁড়িয়েও তেষ্টার জল খাওয়ার অপরাধে কিশোর ইন্দ্রের মর্মান্তিক মৃত্যু বেশ কিছু প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। প্রশ্ন তুলে দিয়ে গেল, কতটা মানবিক, আদৌ কতটা সামাজিক হতে পেরেছে এ দেশের মানুষ? মহাকাশে রকেট পাঠানোর গর্ব করেন দেশের যে নেতারা, তাঁরা মানুষের মধ্যে থাকা জাতপাত, অস্পৃশ্যতার বীজকে, বিদ্বেষের বিষকে কতটুকু তুলে ফেলতে সফল হয়েছেন?

শুধু রাজস্থান তো নয়, সমাজ জুড়েই জাতপাতের এই ভেদাভেদ আজও অটুট। তেমনই অটুট নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের মানুষের অগুণতি অত্যাচারের ঘটনাও। বিজেপি ক্ষমতায় বসার পর তা আরও উচ্চমাত্রা পেয়েছে। নিম্নবর্ণ, দলিত কিংবা মুসলিমরা যেন মানুষই নয়, তাদের পাওনা পদে পদে অবমাননা। স্বাভাবিকভাবেই মেঘওয়াল ঘরের ছেলেদের পড়াশোনা, চাকরির ক্ষেত্রে সুযোগ কম। স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পায় যারা, তাদের স্কুলের মেঝে পরিষ্কার করা, নানা ফাইফরমাশ খাটা, এ সব কাজেই সাধারণত নিয়োগ করা হয়। উচ্চবর্ণের মানুষের সাথে মেলামেশাও বারণ। উচ্চবর্ণের কোনও হিন্দু ছেলে নিম্নবর্গের কোনও হিন্দু ছেলের সাথে বন্ধুত্বও করতে পারে না, তাকে বাড়িতে ডাকতে পারে না। এই ভেদাভেদ স্বাধীনতার সাড়ে সাত দশকেও দূর হল না। শাসকদের সমর্থন ছাড়া এ জিনিস কি সম্ভব?

রাজস্থানের এই গ্রামের মতো দেশের নানা গ্রামে, স্কুলে-কলেজে, বাড়ির মধ্যে সর্বত্র দলিতরা ভয়ে ভয়ে জীবন যাপন করে। দলিত হওয়ার অপরাধে বাড়ির কিশোরীকে তুলে নিয়ে গিয়ে দিনের পর দিন গণধর্ষণ চলে, যুবকদের পিটিয়ে খুন করা হয়, কিংবা দড়ি দিয়ে বেঁধে উলঙ্গ করে পিটিয়ে সোসাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করা হয় সোৎসাহে। পুলিশ-প্রশাসন উচ্চবর্ণের প্রভাবশালীদের কথাই শোনে, তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর পর্যন্ত নেয় না। দেখা যাচ্ছে, প্রতি দশ মিনিটে এক জন দলিতের উপর আক্রমণ হচ্ছে দেশে। ২০২০-তেই শুধু ৫০ হাজারের বেশি দলিত মানুষের উপর হিংসা-নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ৩,৩৭২টিই ধর্ষণ ও গণধর্ষণের ঘটনা, ১১১৯টি হত্যার চেষ্টা ও ৮৫৫টি হত্যার ঘটনা। এটা তো শুধু নথিভুক্ত। অনথিভুক্ত যে এর থেকে বেশি তা বলা বাহুল্য। এনসিআরবি-র রিপোর্ট বলছে, ১৯৯১-২০২০তে ৭ লাখের বেশি দলিতের উপর অত্যাচার হয়েছে, এর মধ্যে ৩৮ হাজারের বেশি দলিত মহিলা ধর্ষিতা হয়েছেন।

স্বাধীনতার পর থেকে সরকার বদল হয়েছে বহুবার, কিন্তু দলিতদের এই দুর্ভাগ্যের বদল হয়নি। কেন এর বদল হল না? আসলে দুর্বলতাটা থেকে গিয়েছে স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যেই। ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসকামী ধারার নেতারা স্বাধীনতা আন্দোলনকে শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক আন্দোলন হিসাবেই দেখেছিলেন। দীর্ঘ সামন্তী শাসনে জাতপাত, ধর্মবর্ণে বিদ্বেষ-বিভাজনের যে ক্লেদ সমাজ জুড়ে জমা হয়েছিল, তাকে মুছে ফেলার জন্য যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের দরকার ছিল, তাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল। কংগ্রেসের গান্ধীবাদী নেতারা বেশিরভাগই এসেছেন তথাকথিত উচ্চবর্ণ থেকে। তাঁরা উচ্চবর্ণজনিত গর্ববোধ থেকে মুক্ত ছিলেন না। স্বাধীনতা আন্দোলন জাতপাত-ধর্মবর্ণের সাথে প্রধানত আপস করেই পরিচালিত হয়েছিল। হিন্দুধর্মীয় প্রভাবে আচ্ছন্ন ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদ। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অটুট থেকে গিয়েছিল কুসংস্কার, অস্পৃশ্যতা, নানা কু-প্রথা। গান্ধীজির মতো কিছু নেতা অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধতা করলেও তাকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করার কোনও উদ্যোগ কংগ্রেস নেয়নি। স্বভাবতই সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কাজ থেকে গিয়েছে চরম অবহেলিত। স্বাধীনতার পরও স্বাভাবিক ভাবেই এ কাজে কোনও উদ্যোগ নেননি সরকারি নেতা-মন্ত্রীরা। দলিতদের, পিছড়ে বর্গের মানুষকে ভোটের বোড়ে হিসাবে ব্যবহার করা ছাড়া এবং জাতপাত-ধর্মবর্ণের বিদ্বেষকে মদত দেওয়া ছাড়া আর কিছু করেননি তাঁরা। এখন দলিত ছাত্রের মৃত্যুর পর তার পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলে সহানুভূতি কুড়নোর চেষ্টা করছেন কংগ্রেসের নেতারা। দলিতদের উপর সীমাহীন নিপীড়ন যে আজও টিকে থাকতে পারল তার জন্য তাদের অনুসৃত নীতিই কি দায়ী নয়?

আর বিজেপির অ্যাজেন্ডাই তো 'হিন্দু, হিন্দি, হিন্দুস্তান', দেশটাকে সামাজিক, রাজনৈতিক ভাবে সম্পূর্ণ 'হিন্দু' রাষ্ট্রে পরিণত করা। এই হিন্দুরাষ্ট্রের হিন্দু কোনও নিম্নবর্ণের দলিত নয়, শুধুমাত্র উচ্চবর্ণ। মনু সংহিতার বিধান অনুসারী বিজেপি নেতারা চায় উচ্চবর্ণের আধিপত্য। আর নিম্নবর্ণের মানুষেরা থাকবে তাদের সেবক হিসাবে। এই চিন্তার ভিত্তিতেই তাদের সব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। নতুন শিক্ষানীতি প্রচলন, নতুন করে ইতিহাস রচনা, পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তু নির্বাচন— সবই সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে। পাশাপাশি শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির রাজনৈতিক সেবক হিসাবে তাদের লক্ষ্য, ধর্ম-বর্ণকে ভিত্তি করে মানুষে মানুষে বিভেদকে জিইয়ে রাখা। তা হলে শাসকদের জনবিরোধী নীতিগুলি কার্যকর করতে সুবিধা। জনসাধারণ যদি নিজেদের মধ্যে বিদ্বেষ-বিভেদে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে তবে এর বিরুদ্ধে একজোট হয়ে প্রতিবাদ করবে কী করে? ব্রিটিশের 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতির রূপায়ণ স্বাধীন ভারতের শাসকরা এভাবেই ঘটিয়েছে। এখন রাজস্থানে কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের বিরুদ্ধে সোরগোল ফেলে দিয়ে বিজেপি নেতারা প্রমাণ করতে ব্যস্ত তারা কত দলিত-দরদি!

স্বাধীনতার আগে বি আর আম্বেদকর জনগণের টাকায় তৈরি মহারাষ্ট্রের মহাদ-এ চাভদর লেক থেকে দলিত সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের জল নেওয়ার অধিকারের দাবিতে ১৯২৭ সালে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। উচ্চবর্ণের প্রভাবশালীরা ব্যাপক অত্যাচার নামিয়ে এনেছিল এই আন্দোলনের উপর। কিন্তু কংগ্রেসের নীতির পরিণতিতে দলিতদের মর্যাদা অর্জনের লড়াইটি স্বাধীনতা আন্দোলনের সামগ্রিক লড়াইয়ের অংশ হতে পারল না, তা একটি বিচ্ছিন্ন আন্দোলনে পরিণত হল। সেদিন এই লড়াইটা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিষ্ঠুর শোষণ থেকে ভারতবাসীর মুক্তির লড়াই। একই সাথে তা ছিল ক্ষমতা দখল করতে চাওয়া ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণির বিরুদ্ধে খেটেখাওয়া মানুষের লড়াই। এতে ধর্ম-বর্ণ-জাত নির্বিশেষে সকল খেটেখাওয়া মানুষের স্বার্থ নিয়োজিত ছিল। তাই জাতপাত বিরোধী লড়াই স্বাধীনতা আন্দোলনের অংশ হিসাবেই আনা দরকার ছিল। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব যেমন সামাজিক এই আন্দোলন থেকে দূরে থাকল তেমনই আম্বেদকর শুধু দলিতদের অধিকার অর্জনের জন্য আলাদা করে লড়াইয়ের কথা বললেন এবং সিডিউল কাস্ট ফেডারেশন গড়ে তুললেন। এতে কার্যত একদিকে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে ফাটল ধরল, উচ্চবর্ণের প্রাধান্য আরও দৃঢ় হল। তিনি পুঁজিবাদী শোষণযন্ত্রের গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত কাটতে পারলেন না এবং অস্পৃশ্যতাও অটুট থাকল।

স্বাধীন ভারতে জাতপাত-অস্পৃশ্যতা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে আইনে গৃহীত হলেও তাতে দলিত, নিম্নবর্গের মানুষের উপর অত্যাচার বন্ধ হল না। ১৯৫৫-তে প্রোটেকশন অব সিভিল রাইটস, প্রিভেনশন অফ অ্যাট্রোসিটিস অ্যাক্ট ইত্যাদি গালভরা নানা আইন এনেছে সরকার। কিন্তু দলিতদের সুরক্ষা নিশ্চিত হয়নি।

বিএসপি, আরজেডি, জেডিইউ সহ দলিত বা নানা জাতের স্বার্থের দাবিদার নানা দল এই বঞ্চনাকে ক্ষমতায় বসার সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করেছে। সিপিএম, সিপিআই প্রমুখ বামপন্থী নামধারী দলগুলি মুখে জাতপাতের বিরোধিতা করলেও এর বিরুদ্ধে কোনও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলেনি। নকশালপন্থী

আটের পাতায় দেখুন

শিবদাস ঘোষের চিন্তায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন

তিনের পাতার পর

ভারতবর্ষে একটি জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে সমস্ত উপজাতিগুলিকে (ন্যাশনালিটিস) একসূত্রে বেঁধে ফেলল *(ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও আমাদের কর্তব্য, রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৭-২৮৮)*।

জাতীয় স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী এত বড় একটা জাতীয় ভাবাবেগ তৈরি হলেও কেন ভারতের জনগণ ধর্ম, বর্ণ, জাতপাত, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ইত্যাদির ঊর্ধ্বে উঠতে পারল না, কেন স্বাধীন ভারতে এই সব বিভেদমূলক প্রবণতা রয়ে গেল, কেন আজও দলিত নিগ্রহ ঘটছে, তা গভীর বেদনার সাথে উপলব্ধি করেছেন শিবদাস ঘোষ। এর মূল কারণ যে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীজির নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসের হিন্দু ধর্মভিত্তিক আন্দোলন, ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবাধীনে আন্দোলন, তা তিনি অনুভব করেছিলেন। তিনি বলেছেন, ... "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতের সমস্ত উপজাতিগুলি মিলে একটি আধুনিক জাতি গড়ে ওঠার যে প্রক্রিয়া শুরু হল, গোড়া থেকেই তার মধ্যে কতগুলো দুর্বলতা থেকে গেল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনৈতিক কর্মসূচির মধ্যে সামাজিক বিপ্লব ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কর্মসূচিকে মেলাতে সক্ষম না হওয়ার ফলে গোটা জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে কতগুলি দুর্বলতা থেকে গেল। জাতীয় আন্দোলনকে আমরা ধর্মীয় ভাবনাধারণা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে সমর্থ হইনি। তাই স্বাধীনতা লাভের পর রাজনীতিগত ভাবে আমরা একটি আধুনিক জাতি হিসাবে গড়ে উঠলেও ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও আচারকে ভিত্তি করে আমাদের দেশের জনসাধারণ বিচ্ছিন্ন ও আলাদা আলাদা সম্প্রদায় হিসেবেই থেকে গেল" *(ওই, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৮)*। তিনি আরও বলেছেন, "সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপস করার ফলে ভারতীয় বুর্জোয়াদের দ্বারা সমাজের গণতন্ত্রীকরণের পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কাজগুলি সম্পূর্ণ করা এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী উপজাতি এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের একীকরণের কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব ছিল না এবং হয়ওনি। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনাকালে বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভারতীয় জনসাধারণ রাজনৈতিকভাবে একটি জাতিতে পরিণত হল বটে, কিন্তু জাতীয় বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে সামন্ততন্ত্র, সামন্ততান্ত্রিক অনৈক্য এবং ধর্মীয়বন্ধনের বিরুদ্ধে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করে সমাজের গণতন্ত্রীকরণের কাজ সম্পূর্ণভাবে অবহেলা করার দরুন ভারতীয় জনসাধারণ ধর্ম-বর্ণ-ভাষাগত কারণে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক সম্প্রদায় হিসেবেই টিকে রইল" *(সাম্প্রদায়িক সমস্যা প্রসঙ্গে, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৮)*।

স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতীয় কংগ্রেসের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির কুফল

"এরূপ ঘটার প্রধান কারণ, স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল ভারতবর্ষের জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি। ভারতবর্ষের পুঁজিবাদের বিকাশ ও জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সৃষ্টি এমন একটা সময়ে এল যখন বিশ্ব পুঁজিবাদ তার সমস্ত প্রগতিশীল চরিত্র হারিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদে পর্যবসিত হয়েছে। ভারতীয় জাতীয় পুঁজিবাদ তখন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী হলেও ওই ক্ষয়িষ্ণু বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থারই অংশ বিশেষ। তাই পুঁজিবাদী বিপ্লবের যুগে পুঁজিবাদের যে বিপ্লবী চরিত্র ছিল, ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের যুগে ভারতীয় পুঁজিবাদের সেই বিপ্লবী চরিত্র আর ছিল না। তাই ভারতের জাতীয় বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিলেও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণির অংশ হিসাবে তাদের বিপ্লবী চরিত্র ছিল না, তারা মূলত হয়ে পড়েছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংস্কারপন্থী বিরুদ্ধবাদী (রিফরমিস্ট অপজিশন্যাল)। ফলে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে আমরা বুর্জোয়া মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী দু'টি ধারা দেখতে পাই। একটি সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের সাথে আপসমুখী এবং গোটা আন্দোলনে এইটিই মুখ্য ধারা ছিল। অপরটি ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের ধারা" *(ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও আমাদের কর্তব্য, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৮-২৮৯)*। আপসমুখী ধারার নেতৃত্বে ছিলেন গান্ধীজি। আপসহীন ধারার নেতৃত্বে ছিলেন নেতাজি। এর মধ্যে গান্ধীজির আপসমুখী ধারাটিই ছিল প্রবল।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামের কর্মসূচির মধ্যে কেন সামাজিক বিপ্লব ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কর্মসূচিকে মেলানো গেল না, তার আরেকটি কারণ, স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতীয় কংগ্রেসের প্রাধান্য। আর তা কাটিয়ে ওঠা গেল না তথাকথিত কমিউনিস্ট দলটির ভ্রান্ত ভূমিকার জন্যই। শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন— "গোটা স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে জরাগ্রস্ত আপসমুখী মানবতাবাদী ভাবধারার প্রাধান্যের জন্যই রাজনৈতিক বিপ্লবের কর্মসূচির মধ্যে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিপ্লবের কর্মসূচিকে আমরা যুক্ত করতে পারিনি। এটাই ছিল গোটা আন্দোলনের দুর্বলতার প্রধান দিক। রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে কার্যকরীভাবে এর বিশেষ বিরোধিতা করা সম্ভব না হলেও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র ও নজরুল, অবহেলায় পরিত্যক্ত ও ভূলুণ্ঠিত সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিপ্লবের ঝান্ডাটিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। নেতৃত্ব জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির হাতে (অর্থাৎ জাতীয় কংগ্রেসের হাতে) থাকার ফলে এ প্রচেষ্টা শেষপর্যন্ত পুরোপুরি সফল না হলেও স্বাধীনতা আন্দোলনের হাজার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতার মধ্যে মানবতাবাদী ভাবাদর্শের এইটিই ছিল বলিষ্ঠতার দিক। এই দুর্বলতা ও বলিষ্ঠতা— এই দু'টি দিক নিয়েই এ দেশের মানবতাবাদী ভাবাদর্শ ও মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে যে নতুন নৈতিকতার মান গড়ে উঠেছিল, সেটাই সেদিন সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সর্বপ্রকার গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কারণ বুর্জোয়া মানবতাবাদ সেদিন ছিল দেশের স্বাধীনতা ও সমাজপ্রগতির পরিপূরক। জাতীয় স্বাধীনতা লাভের পর বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম ও পুঁজিবাদ সংহত হওয়ার সাথে সাথে সেদিনকার প্রগতিশীল বুর্জোয়া মানবতাবাদী ভাবাদর্শ ও মূল্যবোধগুলি আজ শাসক শ্রেণির হাতে প্রিভিলেজে বা সুবিধায় পর্যবসিত হয়েছে। অর্থাৎ বুর্জোয়া মানবতাবাদী ভাবাদর্শ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ধারণা তার প্রগতির চরিত্র হারিয়ে আজ শ্রমিক ও শোষিত জনসাধারণের আন্দোলনকে দমন করা ও শোষিত শ্রেণির চেতনাকে বিপথগামী করার কাজে শোষক শ্রেণির হাতে মতাদর্শগত হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে" *(ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও আমাদের কর্তব্য, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৮)*। এই কারণেই জাতীয়তাবাদী আদর্শ আর সমাজের কল্যাণ করতে পারে না। এটা শোষক শ্রেণির আদর্শ। মানুষকে ঠকানোর আদর্শ। এর বিরুদ্ধেই যুবসমাজকে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে।

স্বাধীনতা আন্দোলনে তদানীন্তন কমিউনিস্ট পার্টির হঠকারী ভূমিকা

স্বাধীনতা আন্দোলনের এই দুর্বলতার কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি আরও বললেন, "যদি আমাদের দেশের এই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির বদলে শ্রমিক শ্রেণির হাতে থাকত তা হলে শুধু যে সাম্রাজ্যবাদীদের সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করা সম্ভবপর হত তাই নয়, উপরন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশকে অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথে নিয়ে যাওয়া এবং জাতিগত সাম্প্রদায়িক এবং বর্ণগত সমস্যারও চিরতরে সমাধান সম্ভব হত ... কিন্তু ভারতবর্ষের বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বলতা ও কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী রাজনৈতিক দলটির সুবিধাবাদী রাজনীতি ও কখনও কখনও এমনকী মুক্তি আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার দরুনই এ দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব জাতীয় বুর্জোয়াদের হাতেই থেকে গেল" *(সাম্প্রদায়িক সমস্যা প্রসঙ্গে, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৭)*।

বিষয়টিকে আরও ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন, "সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের যে সময়ে এ দেশে কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী এই পার্টিটির জন্ম হয়, সেই সময়ে কংগ্রেস আজকের মতো সরাসরি এবং পুরোপুরি বুর্জোয়া শ্রেণির পার্টিতে রূপান্তরিত হয়নি। কমিনটার্নের দলিলেও এ কথার স্বীকৃতি আছে। ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিই তখন কংগ্রেসের মধ্যে ছিল। অর্থাৎ স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই সময়ে কংগ্রেসের চরিত্র ছিল অনেকটা প্ল্যাটফর্মের মতো। জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই সময়ে কংগ্রেসের মধ্যে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির নেতৃত্বকে বিচ্ছিন্ন করে তার ওপর শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার দ্বারা কংগ্রেসকে একটি খাঁটি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণফ্রন্ট (অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট পিপলস ফ্রন্ট) হিসাবে রূপ দেওয়ার সম্ভাবনা তখন পুরোমাত্রায় বর্তমান ছিল এবং একটি বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণির দলের পক্ষে সে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ছিল অবশ্যকরণীয় কাজ। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী এই পার্টিটি (সিপিআই, যার মধ্যে সিপিআই (এম), সিপিআই (এম এল)-এর গ্রুপগুলি ছিল) তথাকথিত বি টি রণদিভে গ্রুপের নেতৃত্বে ১৯৩০ সালে চূড়ান্ত সংকীর্ণতাবাদী নীতি অনুসরণ করে কংগ্রেসের নেতৃত্বে গোটা স্বাধীনতা আন্দোলনটাকেই প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াদের আন্দোলন বলে আখ্যা দিলেন এবং তার থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখলেন। ... এই ভাবে স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি, যারা কংগ্রেসের মধ্যে নেতৃত্ব দিচ্ছিল, স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের নেতৃত্বকে পাকাপোক্ত করতে সাহায্য করলেন" *(কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এসইউসিআই একমাত্র সাম্যবাদী দল, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২০)*।

কেন সিপিআই স্বাধীনতা আন্দোলনে এরূপ হঠকারি লাইন নিল সে সম্পর্কে গভীর বিশ্লেষণ করে শিবদাস ঘোষ বলেছেন, এই ভুলের কারণ তারা কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করতে পারেনি। এই কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করার জন্য জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে জাতীয়তাবাদী এবং সামন্তী ভাবনা-চিন্তা-সংস্কৃতির অবশেষের মূলোচ্ছেদ ঘটিয়ে কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করার জরুরি কঠিন কঠোর সংগ্রামটি তারা এড়িয়ে গেছেন। দ্বিতীয়ত, কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, যা লেনিনীয় পদ্ধতি তাকে অনুসরণ করেননি। এ বিষয়ে শিবদাস ঘোষ বলেছেন, "এ দেশের কমিউস্টি পার্টি নামধারী দলটি গঠনের পিছনে এ দলের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অনেকের এবং অনেক নেতা ও অসংখ্য কর্মীর গভীর নিষ্ঠা, সততা ও আত্মত্যাগের কথা আমি জানি এবং আমি তাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখেই দেখি। কিন্তু তাঁদের এত আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠা সত্ত্বেও গোড়া থেকেই কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ না করার জন্য তাঁরা যে এ দলটিকে একটি মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী দল হিসাবে গড়েই তুলতে পারেননি, এ সত্যেকেও আমি কোনও মতেই অস্বীকার করতে পারি না" *(ওই, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯১)*।

তাহলে সিপিআই-সিপিএম কী ধরনের পার্টি? শিবদাস ঘোষের বিশ্লেষণ, "আমাদের বিচারে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি একটি সঠিক সাম্যবাদী দল নয়। এটি একটি 'কমিউনিস্ট নামধারী পেটিবুর্জোয়া বামপন্থী সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি" *(সময়ের আহ্বান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮২)*। ভারতের কমিউনিস্ট নামধারী এই পার্টিটি হঠকারি লাইন নিয়ে যদি স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেসের নেতৃত্বকে পাকাপোক্ত করতে সাহায্য না করত, যদি তাদের নেতৃত্ব থেকে উৎখাত করে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে মার্ক্সবাদসম্মত ভূমিকা পালন করত, তবে চিনের মতো ভারতেও স্বাধীনতা আন্দোলনে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসানের পাশাপাশি দেশীয় পুঁজিপতিদের শোষণেরও অবসান ঘটত। কিন্তু তা ঘটল না আলোচিত ঘটনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে। এই অবস্থায় শোষিত মানুষের করণীয় কী? শিবদাস ঘোষ ডাক দিলেন মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদকে হাতিয়ার করে পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের।

পুঁজিবাদ কী ভাবে আজ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনকে তছনছ করে দিচ্ছে, নানা দিক থেকে দেখিয়ে পুঁজিবাদবিরোধী আন্দোলনের আদর্শগত হাতিয়ার মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের ভাণ্ডারকে তিনি আরও সমৃদ্ধ করেছেন। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের নানা রকম ত্রুটি চিহ্নিত করে সেগুলি কাটানোর মার্ক্সবাদী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দেখিয়েছেন। শুধু ভারতের শ্রমিকশ্রেণির কাছেই নয়, এই পথেই তিনি বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি আন্দোলনের আদর্শগত নেতায় উন্নিত হয়েছেন। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে সংগ্রাম করতে গিয়ে এই আদর্শগত ভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে কোথায় তিনি অনন্য, জন্মশতবর্ষে চলছে তা উপলব্ধির নিবিড় সংগ্রাম।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

জঙ্গল-জীবিকা ধ্বংসকারী আইন অবিলম্বে বাতিলের দাবি

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসকে স্মরণ করে ২৮ আগস্ট 'ফেডারেশন অফ আদিবাসী অর্গানাইজেশনস'-এর উদ্যোগে কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশন (মেন) -এর 'বরুণ বিশ্বাস স্মৃতি হল'-এ এক সভার আয়োজন করা হয়। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার এবং সাহিত্যিক দুর্গাদাস সরেন। সভাপতিত্ব করেন নেপাল সিং। উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক পরিমল হাঁসদা, বিসম্বর মুড়া, কোষাধ্যক্ষ বিভীষণ সরেন, সঙ্গীতশিল্পী শিখা মান্ডি, অধ্যাপিকা কবিতা হাঁসদা, মিত্র ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক হরিদাস মুন্ডা প্রমুখ। সভায় ২০২২ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ ৩০ জন আদিবাসী গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের বন ও পরিবেশ মন্ত্রক গত ২৮ জুন 'বন সংরক্ষণ রুল ২০২২'-এর বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামসভার অনুমতি ছাড়াই জঙ্গলের জমি অন্য কাজে ব্যবহারের জন্য বেসরকারি বৃহৎ শিল্পপতি সংস্থার হাতে তুলে দিতে পারবে। স্বাভাবিকভাবেই সভায় দাবি ওঠে— 'মানুষ উচ্ছেদকারী জঙ্গল ও জীবিকা ধ্বংসকারী 'বন সংরক্ষণ রুল' অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। আদিবাসীদের উপর বিভিন্ন রকমের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন বন্ধ করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতালি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষক নিয়োগ, পুস্তক প্রণয়নের দাবি সহ কুরুখ মাধ্যম বিদ্যালয়, মুন্ডারি মাধ্যম বিদ্যালয়, সাদরি মাধ্যম বিদ্যালয় খোলার দাবি করা হয়। সভায় স্লোগান ওঠে— 'জঙ্গল অধিকার আইন ২০০৬' সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করতে হবে। আদিবাসী ও গ্রামসভার সম্মতি ছাড়া অরণ্যের জমি হস্তান্তর করা চলবে না। বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের অজুহাতে আদিবাসীদের উচ্ছেদ বন্ধ করতে হবে।

দার্জিলিং-এ আশাকর্মীদের সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের দার্জিলিং জেলার আর আর ব্লকের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল তিস্তা ভ্যালির কমিউনিটি হলে ২৬ আগস্ট। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ইসমত আরা খাতুন এবং শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি-র দার্জিলিং জেলা ইনচার্জ জয় লোধ। দেড়শোরও বেশি প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন থেকে সুজাতা খাওয়াসকে সভাপতি ও নিশা তামাংকে সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত করে ৩০ জনের কমিটি গঠিত হয়।

মালদায় মিড ডে মিল কর্মীরা আন্দোলনে

মিড ডে মিল কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি, ১০ মাসের পরিবর্তে ১২ মাসের বেতন সহ ১৩ দফা দাবিতে ১৯-২৫ সেপ্টেম্বর দাবি সপ্তাহ পালনের ডাক দিয়েছে সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়ন। কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে ২৮ আগস্ট মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে তুলসীহাটা হাইস্কুলে একটি সভা হয়। বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা সুনন্দা পণ্ডা, এআইইউটিইউসি-র মালদা জেলা সম্পাদক অংশুধর মণ্ডল, হরিশ্চন্দ্রপুর ইউনিটের সংগঠক সাথী চৌধুরী প্রমুখ। সুনন্দা পণ্ডা জানান, অন্যান্য রাজ্যে মিড ডে মিল কর্মীদের অনেক সুবিধা থাকলেও পশ্চিমবঙ্গ ব্যতিক্রম। মিড ডে মিল কর্মীদের দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চনা করে আসছে রাজ্য সরকার। কর্মীদের অবিলম্বে সরকারি কর্মীর মর্যাদা দেওয়া, মিড ডে মিলের বেসরারিকরণ রদ, ন্যূনতম মাসিক বেতন ২১ হাজার টাকা করা সহ ১৩ দফা দাবি জানান তিনি। সরকার অবিলম্বে দাবিগুলি না মানলে সংগঠন বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে বলে তিনি ঘোষণা করেন।

বিলকিস বানো ঃ ধর্ষকদের সাজা বহালের দাবিতে
রাষ্ট্রপতিকে স্মারকলিপি লিগাল সার্ভিস সেন্টার

লিগাল সার্ভিস সেন্টারের সভাপতি বিচারপতি মলয় সেনগুপ্ত এবং সম্পাদক আইনজীবী ভবেশ গাঙ্গুলি ২৬ আগস্ট ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে এক স্মারকলিপি দিয়ে বিলকিস বানো গণধর্ষণ ও হত্যা মামলায় দণ্ডিত ১১ জন দুষ্কৃতীর সাজা মকুব প্রত্যাহার করার আবেদন জানিয়েছেন। তাঁরা স্মারকলিপির কপি কেন্দ্রীয় সরকারের আইনমন্ত্রী, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, গুজরাট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার কাছে পাঠিয়েছেন।

স্মারকলিপিতে তাঁরা বলেছেন, ২০০২ সালে গুজরাট দাঙ্গার সময় গণধর্ষণ ও গণহত্যার এই মামলা মুম্বই হাইকোর্টের দৃষ্টিতে অপরাধের ভয়াবহতার দিক থেকে বিরলতম। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত উক্ত ১১ জন অপরাধীকে স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষ উপলক্ষে মুক্তিদান চরমতম লজ্জার। আরও লজ্জার যে, শাসক দল তাদের বীরের মর্যাদা দিয়ে মালা পরিয়েছে। এই মামলার বিচারক ইউ ভি সালভি এবং আইনজীবী শোভার স্পষ্ট বক্তব্য—১৯৯২ সালের সাজা মকুব নীতিতে বলা আছে ধর্ষক, সন্ত্রাসবাদী এবং অর্থ পাচারকারীর সাজা মকুব করা যাবে না।

সমস্ত কিছুকে পদদলিত করে গুজরাট সরকারের 'সাজা মকুব' কমিটি তাদের যে মুক্তি দিল তা সাধারণভাবে সমস্ত জনগণ, বিশেষভাবে সংখ্যালঘুদের কাছে আতঙ্কের বার্তাবাহী। ইতিমধ্যেই বিলকিস বানোর গ্রাম থেকে সংখ্যালঘুরা পালাতে শুরু করেছেন। তাঁরা নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছেন। লিগাল সার্ভিস সেন্টারের দাবি, অপরাধীদের সাজা মকুবের রায় অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে।

এআইএমএমএসের প্রতিবাদ ঃ বিলকিস কাণ্ডে সাজাপ্রাপ্ত ১১ অপরাধীর মুক্তিদানের প্রতিবাদে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন জেলায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। পথসভা, মিছিল, স্লোগান স্কোয়াডের মধ্যে দিয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়। এছাড়াও প্রতিটি জেলায় জেলায় গ্রুপ বৈঠক, আলোচনা সভা, ছোট ছোট মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এই ঘটনা সাধারণভাবে সকল মহিলা এবং বিশেষভাবে মুসলিম জনগোষ্ঠীর পক্ষে যে বিপজ্জনক তা ব্যাখ্যা করেন নেতৃবৃন্দ। নারীসমাজকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আবেদন জানান তাঁরা।

পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে বিক্ষোভ

বাঁকুড়ায় সিপিডিআরএস-এর সভা ঃ ২৮ আগস্ট বাঁকুড়া কোর্ট প্রাঙ্গণ সভাগৃহে সিপিডিআরএস-এর জেলা শাখার উদ্যোগে 'স্বাধীনতার ৭৫ বছর ও মানবাধিকার' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক প্রণব কুমার দত্ত। সভার শুরুতে গুজরাটে বিলকিস বানোর গণধর্ষণ ও হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিতদের অন্যায় ভাবে মুক্ত করার প্রতিবাদে নিন্দা প্রস্তাব পাঠ করেন আইনজীবী সুব্রত দাস মোদক। বক্তব্য রাখেন অশোক কুমার চক্রবর্তী। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন অধ্যাপক অচিন্ত্য মাজি। সংগঠনের উপদেষ্টা ডাঃ সজল বিশ্বাস মানবাধিকার রক্ষা আন্দোলনের জরুরি প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে সকল সংবেদনশীল মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

মানে বুঝল রক্তের নোনতা স্বাদে

ছয়ের পাতার পর

দলগুলি আবার জাতপাতের লড়াইকে 'শ্রেণিসংগ্রাম' আখ্যা দিয়ে এই লড়াইকে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। দলিতদের ভোটার হিসেবে ব্যবহার করেছে। ফলে লড়াইয়ের সঠিক দিশা না পেয়ে দলিত সহ নিম্নবর্ণের মানুষেরা এই শোষণমূলক রাষ্ট্রের জাঁতাকলে পিষ্টই হয়ে চলেছে।

তাদের এই শোষণ যন্ত্রণা, অবমাননা থেকে মুক্তির যথার্থ পথ দেখালেন এ যুগের মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) -এর প্রতিষ্ঠাতা কমরেড শিবদাস ঘোষ। তিনি বললেন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলিকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবি আদায়ের কর্মসূচির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে হবে না। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কাজ পূরণ করার কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে, যা আমাদের দেশে আজও অপূরিত আছে। জাতপাত-ধর্মবর্ণ প্রভৃতি সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার যে অবশেষগুলি আজও সমাজে রয়ে গেছে, এগুলির বিরুদ্ধে বুর্জোয়ারা আজ আর কোনও আন্দোলন তো করবেই না, উপরন্তু এগুলিকে কাজে লাগিয়ে তারা ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করছে। তাই এই আন্দোলনকে আজ পুঁজিবাদী শোষণের জোয়াল থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে পরিচালিত শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামের সাথে যুক্ত করতে হবে।

পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে আপামর শোষিত শ্রেণির যে লড়াই তার সাথে জাতপাত, ধর্মবর্ণ, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনকে যুক্ত না করা গেলে আবারও ঘোড়ায় চড়ার অপরাধে, সামাজিক অনুষ্ঠানে যাওয়ার অপরাধে, উচ্চবর্ণের জন্য নির্দিষ্ট পাত্রের জল খাওয়ার অপরাধে ইন্দ্রের মতো কিশোরদের অকালমৃত্যু ঘটতেই থাকবে, মা-বোনেরাও ধর্ষিতা হতেই থাকবেন। আমরাও দর্শক হয়েই থাকব একের পর এক মর্মান্তিক ঘটনার।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com